সূচীপত্র

বিপ্ন-ভারত

প্রথম খণ্ড

—*—

মনোময় ভারত

অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

এম. এ., পি. আর. এস্., পি, এইচ্. ডি.।

ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব

কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

মূল্য ১।৹ পাঁচ সিকা মাত্র।
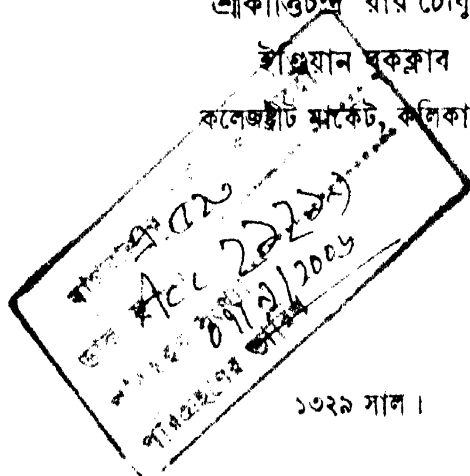
মুখবন্ধ

ইউরোপের মহাযুদ্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপুল আয়োজনের বিরাট ব্যর্থতা এসিয়াবাসীর নিকট প্রকট করিয়াছে। মানুষের বিজ্ঞান বা সমাজের শক্তির চরম উন্নতির মাঝখানেও যে একটা প্রকাণ্ড নিষ্ফলতা মুখব্যাদান করিয়াছে তাহাতে পাশ্চাত্য মনস্বীগণও এখন ত্রস্ত, হতবুদ্ধি। তাই পাশ্চাত্যের সমস্ত কল্পনা ও ভাবুকতা নূতন প্রকার গঠনে এবং গঠনের নূতন উপকরণ সংগ্রহে আজ বদ্ধপরিকর। বিজ্ঞানের কৌশল, শিল্পের উন্নতি, রাষ্ট্রের বিস্তারের মধ্যেও মানুষের মধ্যে প্রাণের টান, হৃদয়ের যোগ, না থাকিলে যে সমাজের শান্তি ও ব্যক্তিত্ববিকাশ সুদূর পরাহত,—ইহাই বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা। তাই বিজ্ঞান, দর্শন, রাষ্ট্রগঠন, সমাজবন্ধন সকলই আজ নূতন মাপকাটিতে বিচারিত হইতেছে। প্রাচ্য জগতের বহু পুরাতন মাপকাটিটা আজও কি পরিত্যক্ত রহিবে, যুগধর্ম্ম গঠনে কোন কাজে লাগিবে না?

নূতন সভ্যতা প্রজাপতির মত পুরাতন সভ্যতার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। কিন্তু প্রাচ্যজগতে আমরা এখনও সেই উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতার বুলি আওড়াইতেছি। উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্র ও শিল্পবন্ধন শ্রেণী-বিভাগ ও সংঘর্ষের ভিত্তিতে স্থাপিত। প্রাচ্য জগতে নূতন প্রজাতন্ত্র ও নূতন শিল্পরীতি পাশ্চাত্যের অনুকরণে গঠন করিতে যাইয়া আমরা যে সামাজিক অশান্তি ও সাম্যতন্ত্রের স্থূল ভাব আমদানী করিয়াছি তাহা আমাদের সভ্যতার বিকাশ ও আদর্শের সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

কিন্তু তাই বলিয়া বিশ্ব-শক্তিকে একবারে বর্জ্জনও করা যায় না। ইহা কখনও সম্ভব নহে যে আমরা যুগ-শক্তি হইতে কিছুই সঞ্চয় করিব না। এটা কিছুতেই বলিলে হইবেনা যে,—আমরা অর্থ চাইনা, বিজ্ঞান চাই না, রাষ্ট্রের শাসন চাইনা, সভ্যতা চাইনা, কারণ বর্ত্তমান যুগে সবই স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ যোগাইয়াছে, অথবা মানবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরায় হইয়াছে। আমরা প্রজাতন্ত্র গঠন করিব, কিন্তু রাষ্ট্র আমাদের সর্ব্বভুক্ হইবে না, ইতিহাসলব্ধ সমাজ শাসনের বিচিত্র অনুষ্ঠানগুলির স্বাধীনতা আমরা অক্ষুণ্ণ রাখিব। আমরা নূতন শিল্প ব্যবসায় অবলম্বন করিব কিন্তু ধনী ও শ্রমজীবীর সংঘর্ষ আনিব না, যে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমবায়পদ্ধতিতে আমাদের গ্রাম্য সমাজে কৃষি ও শিল্প যুগপরম্পরায় অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে তাহাকে আমরা পুনর্জীবিত করিব। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আমরা অবলম্বন করিব কিন্তু বিজ্ঞানের ভীষণ নিষ্ঠুর ভাব আমরা গ্রহণ করিব না, প্রকৃতির বিচিত্র মূর্ত্তির মধ্যে আমরা অফুরন্ত রসাস্বাদনের উপকরণ গ্রহণ করিতে থাকিব। বিজ্ঞানের মিথ্যা আদর্শ আছে বলিয়া বিজ্ঞানকে ত্যাগ করা যায় না। রাষ্ট্র দুর্ব্বলপীড়নের যন্ত্র হইয়াছে বলিয়া রাষ্ট্রকে উপেক্ষা করা যায় না। বর্ত্তমান শিল্পরীতি ধনী ও শ্রমজীবীর বিরোধ ঘটাইয়াছে বলিয়া শিল্পকে বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না। সহজ সরল জীবনের মধ্যে একটা ভাবুকতা আছে জানি—সে ভাবুকতা বর্ত্তমান সভ্যতার বিলাস উপভোগের দম্ভকে লাঞ্ছনা না দিলে নূতন শিল্প-বন্ধন, নূতন রাষ্ট্রগঠনের কোন সম্ভাবনাও নাই তাহা জানি; কিন্তু সভ্যতার বিকারের উপর রাগ করিয়া বনে যাইলে চলিবে না। বরং বর্ত্তমান সভ্যতা আমাদিগকে যে বিজ্ঞানের সম্পদ, যে রাষ্ট্র ও সমাজ-গঠনের উপকরণ দান করিল তাহা ঘরে তুলিয়া লইতে হইবে। আমাদের জাতির ভাণ্ডারে যাহা কিছু নিত্যবস্তু সযত্নে রক্ষিত আছে, তাহার সঙ্গে

মিলাইয়া লইতে হইবে। ভাণ্ডার আমরা খালিও করিব না, বাহির হইতে কোন দ্রব্য প্রত্যাখ্যানও করিব না।

এই গ্রহণ কাজ বড় কঠিন কাজ। বর্জ্জন অপেক্ষা অনেক কঠিন। ভারত ও ইউরোপের সমাজ বন্ধন, উভয়ের সভ্যতার ক্রমবিকাশের মূল সূত্র, উভয়ের শিল্প, রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের আদর্শের আলোচনা করিয়া আমি এই গ্রন্থে গ্রহণের কথাই বলিয়াছি। কারণ বর্জ্জনের পথ ধ্বংসের পথ, গ্রহণের পথে আমাদের ভুল হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাই জীবনের পথ, প্রতিষ্ঠার পথ। যাহা আমাদের বিশেষত্ব তাহা হইতে আমরা কিরূপে বিচ্যুত হইয়াছি, এবং বর্তমান যুগ-শক্তির মধ্যে ভাব সাধনার দিক হইতে, অথবা সমাজগঠনের দিক হইতে, তাহা আমরা পুনরায় কিরূপে ফিরিয়া পাইতে পারি আমি তাহা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, বর্জ্জনের দিক দিয়া নহে, অবাধ গ্রহণের দিক দিয়াও নহে, সমন্বয়ের পথে আমাদের সভ্যতা স্বাধীনতা লাভ করিয়া বিশ্ব-বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

পাশ্চাত্যের মহাযুদ্ধ ও দেশের নানা ঘটনা পরম্পরার আশা ও নিরাশার প্রত্যাবর্তনের মধ্যে এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলি লিখিতে লিখিতে এই কথাটি স্পষ্ট বুঝিয়াছি—এবং আমাদের এই কয় বৎসরের চিন্তা ও সমাজের ক্রমবিকাশের ধারাও ইহা নির্দ্দেশ করিতেছে—যে আমাদের সভ্যতার ভবিষ্যৎ ক্রম বিকাশে আমাদের রাষ্ট্র ও শিল্পবন্ধনের মূল শক্তি ব্যক্তি-সর্ব্বস্বতা না হইয়া সমূহের সমবায়-শক্তির মহিমা হইবে। নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ, সমিতি, পঞ্চায়েৎ, দল ও শ্রেণী সমাজ-শক্তির আশ্রয় ও আধার হইয়া রাষ্ট্রীয়-জীবন ও বৈষয়িক উন্নতির সুযোগ বিধান করিবে। এইরূপে এমন একটা সমূহ শক্তি রাষ্ট্র ও শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা লাভ করিব যাহার পরিচয় এতদিন আমরা কেবলমাত্র ধর্ম্মে, দর্শনে ও সমাজ ব্যবস্থায় পাইয়াছিলাম।

নানাদিক বিচার করিয়া জগতের বর্ত্তমান মনীষীগণ এই স্থির সিদ্ধান্তে এখন উপস্থিত হইয়াছেন যে কেন্দ্রীকরণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনক্ষেত্রে জনশক্তির প্রসার সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের মুক্তিলাভের প্রধান উপায়। ধর্ম্মের সংঘ, চারুশিল্পকলা এবং ব্যবসায় শিল্পের সমবায়, রাষ্ট্রের পঞ্চায়েৎ, জাতীয় জীবনকে একটানা কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার কবল হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়—সমাজের বৈচিত্র্য ও ব্যক্তি জীবনের স্বাধীনতা বিকাশের একমাত্র আশ্রয় ও আধার। তাই বর্ত্তমান যুগই হইতেছে সমূহ গঠনের যুগ—কি ধর্ম্ম, কি শিল্প কি সমাজ-সেবা, কি রাষ্ট্র সব দিকেই এখন সমূহের প্রাধান্য। ইহাই হইতেছে যুগ-ধর্ম্ম, এবং এই যুগধর্ম্মের প্রভাবে ভারতের প্রাচীন ও জীর্ণ সমাজব্যবস্থার উপর ইউরোপীয় ভাবুকতার স্পর্শ বালার্ক কিরণের মত সঞ্জীবনী শক্তি আনিয়াছে।

ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার মূলতত্ত্ব এই যে সে এককে বহুর মধ্যে, খণ্ডের মধ্যে, বিশ্ব-বস্তুকে অসংখ্য বিশেষের মধ্যে, উপলব্ধি করিয়াছে। ভারতের রাষ্ট্র-বন্ধন ও শিল্পরীতিও সেই ক্ষুদ্র ও খণ্ডের আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে, বহু সমূহের অবাধ বিকাশের মধ্যে ভারতবাসীর জীবনকে এক সুরে বাঁধিয়া দিবে। একদিকে অসংখ্য গ্রাম্যসমাজের মিলন ও বিরাট সমবায়ের দ্বারা যেমন কৃষি ও শিল্প কার্য্যের উন্নতি সাধিত হইবে, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীর সমবেত স্বামিত্বে খনির ও কারখানার পরিচালনে নবনাগরিক ব্যবসায়ের অর্থের অত্যাচার ও অনৈক্য দূর হইবে, অপর-দিকে অসংখ্য স্বাধীন কেন্দ্রে কৃষক-প্রজাতন্ত্র নূতন দায়িত্ব লাভ করিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান শোষণ ও যন্ত্রবৎ পরিচালন-রীতিকে প্রতিরোধ করিবে। দেশে যে রাষ্ট্রীয় ভাবুকতা এখন দেখা গিয়াছে ইহার ফলে যদি সত্য সত্যই আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ সমাজ শাসন শক্তিকে

জাগাইয়া তাহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্যসমাজ ও কৃষি ও শিল্প সমাজের সম্মিলিত সমবায়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তাহা হইলে আমরা শুধু যে পাশ্চাত্য জগতের গত শতাব্দীর শিল্প ও রাষ্ট্র বিপ্লবের নিদারুণ ইতিহাস এদেশে পুনরাবৃত্তি করিব না তাহা নহে, আমাদের অতীত ইতিহাসের জীবনধারার মূল সূত্রকে খুঁজিয়া পাইয়া তাহাকে আরও শক্ত, আরও বিচিত্র, আরও ব্যাপক ভাবে বুনিয়া সমস্ত দেশকে শান্তি ও সুসামঞ্জস্যের, সামাজিকতা ও জাতীয়তার সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া দিব। বিলাতের আমদানী নূতন ডিমোক্রেসিও শিল্পরীতির প্রগল্ভতা ও মিথ্যা আড়ম্বরের পরিবর্ত্তে আমরা তখন সমাজের স্বাভাবিক শক্তি ও যোগ্যতার পরিচয় পাইব।

বিশ্বসভ্যতা এক্ষণে রাষ্ট্র ও শিল্পের নিগড়ে শৃঙ্খলিত। মানুষ শান্তি-রক্ষা ও বিলাসভোগকল্পে রাষ্ট্র ও শিল্পকে সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু যাহা সমাজরক্ষা ও সমাজস্থিতির কারণ তাহাই এই যুগে ব্যক্তিত্বের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ না দিয়া সমাজের মুক্তির অন্তরায় হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে এখন তাই এমন এক সমাজবন্ধন রীতির প্রয়োজন হইয়াছে যাহা মানুষকে আবার তাহার অনুভূতি ও জন্মাধিকারের স্ফুরণ কল্পে তাহাকে স্বাভাবিক এবং সহজ বন্ধনে বাঁধিয়া দেয়, যেখানে তাহার উপর শাসন প্রভুর অলংঘ্য বিধান না হইয়া দাসের স্বেচ্ছাসেবায় পরিগণিত হইবে। আমার বিশ্বাস, এই নূতন সমাজবন্ধনে ভারতবর্ষের সমূহ তন্ত্র নূতন উপকরণ দান করিয়া পাশ্চাত্যের নূতন শাসন ব্যবস্থার নির্দ্দেশ করিবে। সর্ব্বগ্রাসী রাষ্ট্র ও শিল্পের অত্যাচার বর্ত্তমান সভ্যতার হলাহল বিষ। রুষিয়ার সাম্যতন্ত্র সেই বিষকে পান করিয়া জগতে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা সুরু করিয়া দিয়াছে। বিশ্বমানব বর্ত্তমান যুগের নির্ম্মম মন্থনে ক্লিষ্ট, বেদনাতুর। আমাদের আশা, বিশ্বমানবের বেদনায়

অবসান তখন হইবে যখন প্রজ্ঞালক্ষ্মী সাগর-মন্থন হইতে পূর্ব্বকূলে উঠিয়া দাঁড়াইবেন, বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবারণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিবেন। নারায়ণের নিকট ভারতলক্ষ্মীর এই বাঞ্ছা ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সার্থকতা।

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থম্, জগদ্ধিতায়, ইহাই হইল ভারতাত্মার বাণী। ভারতবর্ষ তাহার মনোময় রূপটি খুঁজিয়া পাইলে বিশ্ব-বন্ধুও লাভ করিবে। তাই ভারতবর্ষের আদর্শের কথা প্রথম খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয়খণ্ডে পুনর্গঠনের কথা, স্বধর্ম্ম ও বিশ্বধর্ম্মের সামঞ্জস্যের কথা অধিক আছে। দ্বিতীয় খণ্ডের অধিকাংশ অধ্যায়গুলি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের তত্ত্বাবধানে কথিত হইয়াছিল। প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া পরিষৎ আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। সব অধ্যায়গুলি "উপাসনায়" প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।
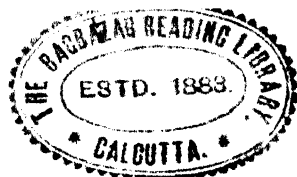
মনোময় ভারত

(ক)

বিশ্বসভ্যতায় হিন্দুসমাজের বাণী *

সাম্রাজ্যবিস্তার ও পাশ্চাত্য আদর্শের প্রাবল্য

ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর হইতেই পৃথিবীতে পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শ প্রবল হইয়াছিল। আরও একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ঐ আদর্শের দ্বারাই পৃথিবীর সমস্ত দেশেরই সমাজ পুনর্গঠিত হইবে। ফরাসী-শক্তির পতনের পর যখন ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছিল, তখন সত্য-সত্যই ইংলণ্ডের চিন্তাবীর দার্শনিকগণ বিবেচনা করিলেন, জগতে বুঝি শীঘ্রই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বেন্থাম্-মিল্-প্রমুখ 'লোকহিত'-প্রচারক (utilitarian) দার্শনিকগণ ভাবিলেন, প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী ও শিক্ষা-বিস্তারের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব ইংলণ্ডের নেতৃত্বাধীনে থাকিয়া শীঘ্রই স্বর্গে পরিণত হইবে। বাস্তবজগতের শক্তিপুঞ্জের সংঘর্ষে এ স্বপ্নের মোহ অনেক কমিয়াছে, কিন্তু স্বপ্ন যে ভাঙ্গিয়াছে, তাহা এখনও বোধ হয় না।

* এই প্রবন্ধটা চারি পাঁচ মাস পূর্ব্বে আমাদের হস্তগত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই প্রবন্ধটি যখন আমাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন, তখন যদি আমরা উহা ছাপিতে পারিতাম, তাহা হইলে পাঠকগণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেন যে, তিনি ইউরোপে যে মহা যুদ্ধ হইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা এখন হইতেছে। যাহাই হউক, আমরা যথাসময়ে প্রবন্ধটি ছাপিতে না পারিলেও, অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া ভবিষ্যতে কিরূপে ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা তাহা অনুমান করিবার ক্ষমতা যে তাঁহার আছে, তাহা প্রবন্ধটির দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। ইহার পূর্ব্বে ছাপিবার সুবিধা হয় নাই। প্রবাসী—আশ্বিন ১৩২১।

প্রবাসী-সম্পাদক।

জর্ম্মানীতে দার্শনিক হেগেল প্রচার করিলেন, বিশ্ব-সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাই জগতে সমাজ-জীবনের আদর্শ। আর এই বিশ্বসাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা কে হইবেন? দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের দর্পহারী জর্ম্মানজাতির অধিনায়ক ফ্রেডরিকের বংশধরগণ। কিন্তু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও ভোগ করিতে লাগিল ইংলণ্ড।

জর্ম্মানীর দুর্ভাগ্য

জর্ম্মানী সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা-কর্ম্মে ইংলণ্ড অপেক্ষা বহুকাল পরে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এশিয়া ও আফ্রিকা ভূখণ্ডের সর্ব্বোত্তম অংশগুলি ইংলণ্ড পূর্ব্বেই দখল করিয়া ফেলিয়াছে; কাজেই জর্ম্মানীকে অপেক্ষাকৃত মন্দ দেশগুলি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। কিন্তু তবুও জর্ম্মানী আশা ছাড়ে নাই;—কি জানি কখন্ সে নূতন রাজ্য লাভ করে। জর্ম্মানী প্রচার করিতেছে, ইংলণ্ড বিলাস ও ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই সাম্রাজ্য চাহে, কিন্তু জর্ম্মানীর সাম্রাজ্য-নীতি সেজন্য নহে! লোকসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়াতে, জর্ম্মানরাজ্য তাহার অধিবাসিগণের অন্নসংস্থানের সুযোগ-বিধান করিতে পারিতেছে না। জর্ম্মানজাতির পক্ষে সাম্রাজ্য জীবন-নির্ব্বাহের জন্য। ইংলণ্ড কিন্তু একথা স্বীকার করে না। জর্ম্মানীর সমস্ত কাজকর্ম্মকে সে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখে।

আধুনিক ইউরোপে রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা

জর্ম্মানী তাহার সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যদি ১০ খান যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণ করে, ইংলণ্ড ১৬টি জাহাজ নির্ম্মাণ করিতেছে। জর্ম্মানী যদি বিমানপোত নির্ম্মাণ করিতেছে, ইংলণ্ড ফ্রান্সের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করিয়া আপনার ও ফ্রান্সের বিমানপোতগুলির সংখ্যা গুণিতেছে। এরূপে জগতের দুইটী প্রধান রাজ্য সাম্রাজ্য স্থাপন ও রক্ষার জন্য বহু অর্থব্যয় করিতেছে। এ অর্থব্যয়ের শেষ নাই। কে কাহাকে হটাইতে

পারে, ইহাই এখনকার রাষ্ট্রীয় জীবনের উদ্দেশ্য। জর্ম্মানীকে ইংলণ্ড জাহাজনির্ম্মাণ কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিতে বলিতেছে। কিন্তু ইংলণ্ডের নৌযুদ্ধবিভাগের মন্ত্রী চার্চ্চিলের যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণে বিরত থাকিবার (naval holidayর) প্রস্তাব জর্ম্মানী নামঞ্জুর করিয়াছে। সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম যুগে ইংলণ্ডে ভাব-প্রবণতা ছিল। বেন্থাম্ ও মিল্ আশার বাণী প্রচার করিতেন। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্-প্রমুখ কর্ম্মবীরগণও কম ভাবুক ছিলেন না। জর্ম্মানী-সন্তান হেগেলের দর্শনবাদও চরম আদর্শবাদের সুরে বাঁধা। কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় জীবনে এ ভাবুকতা একেবারেই স্থান পায় না। সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার যে উচ্চ আদর্শ ছিল, তাহা বাস্তবজীবনের আবেষ্টনের আঘাতে বিনষ্ট হইয়াছে। বিশ্ব-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা যে কোন একজাতির পক্ষে সম্ভব, তাহা এখন কোন পাগলও স্বীকার করিবে না। এমন কি প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য রক্ষা করাই রাজনীতি-ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাম্রাজ্যের প্রসার অসম্ভব। যখন বর্ত্তমান সাম্রাজ্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, যখন রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে “ততঃ কিম্”এর আশা নাই, তখন ভাবুকতা কি প্রকারে থাকিবে? কাজেই আজকালকার রাষ্ট্র-মণ্ডল ভাবুকতার পরিবর্ত্তে সঙ্কীর্ণতা, হিংসা, দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতায় পরিপূর্ণ। ইউরোপ এক্ষণে সর্ব্বদাই একটা মহাযুদ্ধের জন্য যেন প্রস্তুত। ইউরোপের যতগুলি রাজ্য আছে তাহারা হয় ইংলণ্ড না হয় জর্ম্মানীর পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য অগ্রসর। বাস্তবিক ইউরোপের রাষ্ট্রীয় জীবন একটা মহাযুদ্ধের সূচনা করিতেছে। মাঝে মাঝে দুই একজন ভাবুক যুদ্ধের বিরাম আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। নর্ম্যান এঞ্জেল ছদ্মনামধারী লেখক প্রচার করিয়াছেন ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য ব্যাঙ্ক যৌথকারবার প্রভৃতির জন্য এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে একটা বড় রকম যুদ্ধ হইলে জেতা ও বিজিতপক্ষ উভয়ই সমান ভাবে সর্ব্বস্বান্ত হইবে। কিন্তু ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থ, অথবা খৃষ্টানধর্ম্মের উপদেশ,

আন্তর্জাতিক সালিসী আদালত (Arbitration Court) অথবা জাতি-কংগ্রেস্ (Races Congress) কোন রকমেই পাশ্চাত্য জগতে যুদ্ধসজ্জার আয়োজন রোধ করিতে পারিতেছে না। গত বল্কান্ যুদ্ধের খবর যাঁহারা রাখিয়াছেন তাঁহারা জানেন, কয়মাস ইউরোপকে কি অশান্তি ও সংশয়ের সহিত কাটাইতে হইয়াছে। সকলেই জানেন যে বল্কান্ রাজ্যসমূহের অধিবাসিগণ তুর্কীর সুলতানের অধীনে সুখে বাস করিতে ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় বহু শাসনকর্ত্তার আদৌ ইচ্ছা নহে যে ঘৃণিত তুর্কী পবিত্র ইউরোপের এক কোণেও স্থান পায়, কাজেই তাঁহারা তুর্কীর খৃষ্টান প্রজাদিগকে বিদ্রোহের উপদেশ দিতে লাগিলেন। বিদ্রোহের পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যখন তুর্কীর রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল যায় যায়, তখন ইউরোপীয় শাসনকর্ত্তারা ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিলেন, তুর্কী এবার "ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিবে,"—এসিয়ায় আসিয়া মুসলমান শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত হইবে, এশিয়ার মঙ্গল হইবে। ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইল। ইতিমধ্যে বল্কানরাজ্যগুলির মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল। এ গৃহবিবাদ মিটাইতে যাইয়া ইউরোপে মহাসংগ্রামের সূচনা হইল। শেষে কূটনীতির জয় হইল। সমগ্র ইউরোপ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইল না বটে, কিন্তু যুদ্ধশিবির থাকিয়া গেল। শিবির ছাড়িয়া ইউরোপীয়গণের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা সব সময়েই রহিয়াছে।

রাষ্ট্রীয় জীবনে ভাবুকতার অভাব

কি ছিল, আর কি হইল! ইউরোপ উনবিংশ শতাব্দী আরম্ভ করিয়াছিল পৃথিবী জয় করিবার উদ্দেশ্যে। শুধু শস্ত্রের দ্বারা জয় নহে, হৃদয়ের দ্বারা জয়ের জন্য। আশা ছিল, ইউরোপ পতিত নিম্নজাতিসমূহকে উদ্ধার করিবে! শুধু আলেকজাণ্ডার, সিজার, শার্লেমেনের আত্মা নহে; সেণ্ট পল, সেণ্ট পিটার, সেণ্ট ফ্রান্সিসের আত্মাও ইউরোপকে দিগ্বিজয়

কর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। সমগ্র জগতে খৃষ্টিয়ানধর্ম্ম প্রচার করিয়া অসভ্য বর্ব্বর জাতিসমূহকে ত্রাণ করিবার একটা উদ্যম ছিল। খৃষ্টিয়ান শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা অনুন্নত জাতিসমূহকে উত্তোলন করা একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আজ উনবিংশ শতাব্দীর শেষে কি দেখিতেছি ?—এই সমস্ত আশার মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়াছে। পিট্ ডিসরেলীর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে। হেগেল-শিষ্যগণের রাষ্ট্রনৈতিক ভাবুকতা বাস্তবজীবনের সম্পর্কে আসিয়া প্রলাপে পরিণত হইয়াছে। ইউরোপের দিগ্বিজয়ের আশা ব্যর্থ হইয়াছে। এখন দিগ্বিজয় দূরে থাকুক, আত্মরক্ষাই রাষ্ট্রীয় জীবনের চরম লক্ষ্য হইয়াছে। শুধু বিদেশী শত্রু হইতে রক্ষা নহে, দেশের শত্রু হইতেও রক্ষা আবশ্যক। সমগ্র ইউরোপ আজ নিজের ঘর সামলাইবার জন্য সমস্ত শক্তি ও সাধনা নিয়োগ করিতেছে।

(ক) ঘরের শত্রু

প্রথমে ঘরের শত্রুর কথা বলিতেছি। ইউরোপীয় সমাজের বিভীষণ হইয়াছেন সমাজতন্ত্রবাদিগণ। ইহাঁদের মধ্যে দেশ-সেবার প্রবৃত্তি নাই বলিলেই চলে। জাতীয়তার দোহাই ইঁহারা অগ্রাহ্য করিতেছেন। এমন কি বিদেশের শত্রু হইতে যখন ঘোর অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা, তখনও সমাজতন্ত্রবাদিগণ দেশের শ্রমজীবী ও ধনী সমাজদ্বয়ের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত করিতেছেন। এইরূপ দ্বন্দ্ব বাধাইতে ইহাঁরা কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না। ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই সমাজতন্ত্রবাদিগণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন। আর ইহাঁদিগের আশাও বড় কম নহে। পাশ্চাত্য সমাজ যে শিল্প ও ব্যবসার প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধনবলে এত গরীয়ান ও গর্ব্বিত, সেই প্রণালীর তাঁহারা আমূল পরিবর্ত্তন করিবেন। এই পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য যদি সমাজের গোড়াপত্তন ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হয়, তাহাও করিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর। ইহাঁরা যদি কিছুদিন

অপেক্ষা করেন তাহা হইলেও কিঞ্চিৎ সুবিধা ; কিন্তু কিছুতেই ইঁহারা সবুর করিবেন না। কাজেই ইউরোপীয় সমাজের এখন সমস্যা—ঘর দেখিবে, না বাহির দেখিবে, ঘরের শত্রু সামলাইবে, না বাহিরের শত্রুকে ঠেকাইবে?

(খ) বিদেশী শত্রু

আর বাহিরের শত্রু বড় যেমন-তেমন নহে। ইউরোপে রাজ্যে রাজ্যে এখন আকাশ পাতাল তফাৎ নাই, ঊনিশ বিশ তফাৎ মাত্র। সব দেশই ব্যবসায় দ্বারা বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। যুদ্ধের আয়োজনের জন্য সব দেশই অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছে। একারণে ঋণ গ্রহণ করিতেও সব দেশই সমান ভাবেই প্রস্তুত ও অগ্রসর। বিজ্ঞান এখন কোন দেশ-বিশেষের গৌরবের সামগ্রী নহে। বিজ্ঞান আজকাল সমগ্র মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। বিশেষতঃ বিজ্ঞানের যে প্রয়োগ দ্বারা মানুষ মানুষকে সহজে হত্যা করিতে পারে, তাহা ইউরোপের হাট বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। কালের প্রভাবে ধনুর্বিদ্যা ব্যক্তিগত তপস্যালব্ধ ধন নহে। ইউরোপীয় শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট মহাদেবের সযত্নরক্ষিত পাশুপত অস্ত্র শেল ও বাণগুলি নন্দী ভৃঙ্গী অর্থের বিনিময়ে পরিত্যাগ করিতেছে। শিবকে আরাধনা কেহই করিতেছে না, এখন নন্দী ভৃঙ্গীর উপাসনা চলিতেছে। কাজেই ইউরোপীয় সমাজ মহাশ্মশানের মত ভূত পিশাচ দৈত্য দানবের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

আমেরিকার মোহ

কাজেই বিংশশতাব্দীর প্রথমভাগে ইউরোপ দিগ্বিজয়ের আশা একবারেই ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে। আবেষ্টনের আঘাতে ইম্‌পীরিয়ালিজমের*

---

* অর্থাৎ জাতিবিশেষ দ্বারা বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনাতেই মঙ্গল, এই বিশ্বাস।—প্রবাসী-সম্পাদক।

অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের মোহ গিয়াছে। শুধু আমেরিকা আবেষ্টনের আঘাত পায় নাই, তাই এখনও সে আস্ফালন করিতেছে। তাই সে স্পর্দ্ধার সহিত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীন করিয়া দিবে বলিয়া প্রচার করিয়াছে। তাই মেক্সিকোর জনশক্তির প্রতি তাহার এতাদৃশ অবজ্ঞা। আবেষ্টনের আঘাত পাইলে আমেরিকা তাহার 'মিশন'কে এত বড় করিয়া দেখিত না, এবং ফিলিপাইন অধিবাসিগণের শিক্ষা ও দীক্ষার গুরুভারকে সে এত লঘু বোধ করিত না। আবেষ্টনের আঘাত আমেরিকা পায় নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে যে পাইবে না তাহা নহে। প্রাচ্যজগতে জাপানী নূতন বলে বলীয়ান হইয়াছে। চীনও মাথা তুলিয়াছে। আর পানামা খাল কাটিয়া দেওয়াতে দক্ষিণ আমেরিকায় যে এক নূতন রাষ্ট্রশক্তির শীঘ্রই উদ্বোধন হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সমস্ত শক্তির সংস্পর্শে আসিয়া আমেরিকার মোহ এখনও যায় নাই।

নব্য পাশ্চাত্যের তথাকথিত শান্তিপ্রিয়তা

নব ইংলণ্ড এখনও নূতন করিয়া গড়িতে চাহে। কিন্তু ইংলণ্ড এখন পুরাতন লইয়াই ব্যস্ত। ইংলণ্ড নূতন কিছু আর চাহে না। নূতন ব্যবসায়ে নামিবার আর তাহার ইচ্ছা নাই। এখন পুরাতন হিসাবপত্রের অনুযায়ী তাহার প্রাপ্য আদায়গুলি পাইলেই সে সন্তুষ্ট থাকিবে। ইম্পীরিয়ালিজমের পরিবর্ত্তে জিঙ্গোয়িজমের অর্থাৎ যুদ্ধপ্রিয়তার এখন আদর। টেনিসনের আসন কিপ্‌লিং অধিকার করিয়াছেন। নবযুগের নূতন বাণী প্রচার করিবার লোক ইংলণ্ডে কেহ নাই। বৃদ্ধ ফ্রেড্‌রিক হ্যারিসন ইহাঁদের একমাত্র চিন্তাবীর। বার্গেসঁ, মেটারলিঙ্ক, অয়কেন সকলেই বিদেশী। আলষ্টার ও দক্ষিণ আফ্রিকায় গোলমাল বাধিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার গোলমাল মিটিবার আশা নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যে রংয়ের জন্য অধিকারের প্রভেদ যতদিন না যাইবে, ততদিন এ গোলমাল মিটিবে না ;

আর এই প্রভেদ যে জগতে শীঘ্র দূর হইবে, তাহা কেহই বলিতে সাহসী নহেন। ইংলণ্ডের ভিতর যাঁহারা ঘরের লক্ষ্মী, সেই রমণীগণ ঘর দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতেছেন। তাঁহাদিগকে ভোট দিবার ক্ষমতা না দিলে তাঁহাদের নারীজন্ম ব্যর্থ হয়, এই তাঁহাদের অভিযোগ। তাঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইংরেজ ভূম্যধিকারিগণ লয়েড জর্জ্জের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিতেছেন না। যাঁহারা ক্রেসী, পোয়াটিয়ে যুদ্ধ জিতিয়া ইংলণ্ডের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, ইংলণ্ড তাঁহাদের বংশধর ও সমশ্রেণীস্থগণের সম্মান রাখিতেছে না। তাঁহাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে তাহাঁদের ক্ষমতা প্রায় অন্তর্হিত। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে শ্রমজীবিগণ মূলধনী শ্রমব্যবসায়-পরিচালকগণের সহিত তুমুল কলহ আরম্ভ করিয়াছে। ধর্ম্মঘট করিয়া আপনাদের মজুরী বৃদ্ধি করিয়া লইতেছে। লার্কিনিজ্‌ম্ * এখন প্রবল। রাষ্ট্রীয় জগতে ও ব্যবসায়-জগতে ঘরের গোলমাল মিটান ইংলণ্ডের শাসনকর্ত্তাদিগের একটি দুরূহ সমস্যা। আর এ গোলমালকে বাড়িতে দেওয়া কোন মতেই শ্রেয় নহে। কারণ পাছে জর্ম্মান বিমান-পোত বৃটিশ ডকের উপর উড়িয়া আসিয়া শেল্ ছুড়িয়া ডক পুড়াইয়া দেয় এই আশঙ্কায় ইংলণ্ডে অনেক ডক-দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। কান্দাহার-প্রিটোরিয়া-জয়ী লর্ড রবার্টস্ সৈন্যসংস্কার চাহিতেছেন। এই ত গেল ইংলণ্ডের অবস্থা।

---

* অর্থাৎ লার্কিনের মত ও তাহার অনুসরণ। জেম্‌স্ লার্কিন শ্রমজীবীদের একজন নেতা। কোন এক ব্যবসায়ে নিযুক্ত শ্রমজীবীদিগের অধিক পরিশ্রম, কম বেতন বা তদ্রূপ কোন অসুবিধা থাকিলে তাহা দূর করিবার জন্য যদি, অসুবিধা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে, তাহাদের সঙ্গে সহানুভূতি দেখাইবার জন্য অন্যান্য সব ব্যবসায়ের শ্রমজীবীদেরও ধর্ম্মঘট (sympathetic strike) করা উচিত। ইহাই লার্কিনের বিশেষ মত, ও ইহাই তাহার হাতে মূলধনীদের সঙ্গে সংগ্রামের প্রধান অস্ত্র।—প্রবাসী-সম্পাদক।

জর্ম্মানীরও সেই দশা

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সন্ধিস্থাপন জর্ম্মানী অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে। ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় সভাপতি ইংলণ্ডে গেলেন, তাহাতে জর্ম্মানীর কাগজওয়ালাদিগের নানা ভয় ও সন্দেহ উপস্থিত হইল। জর্ম্মানীর দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানায় দুর্গ-নির্ম্মাণ চলিল। কি জানি ফরাসী সৈন্য যদি এল্‌সাস্‌-লোরেনের লোভ সামলাইতে না পারিয়া হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বসে। এদিকে সমাজ-তন্ত্রবাদীরা (social democrats) রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে খুব প্রবল হইয়াছে। জর্ম্মানীর সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা তাহারা চাহে না। যুদ্ধসজ্জার জন্য তাহারা অর্থব্যয় ও শক্তিনাশ করিতে চাহে না। গবর্ণমেণ্টের সমস্ত শক্তি শ্রমজীবিগণের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হউক, ইহাই তাহাদের ইচ্ছা।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মানী প্রতিমুহূর্ত্ত এরূপে দিনে দুপুরে বজ্রাঘাতের প্রতীক্ষা করিতেছে। জর্ম্মানী ইহাদিগের মধ্যে দুঃসাহসী, সে একটা গোলমাল বাধাইতে পারিলেই বাঁচে। ফ্রান্সের তত সৈন্যবল নাই, সে সময় চাহে। আর ইংলণ্ডের পক্ষে তাহার সাম্রাজ্য-রক্ষা প্রধানতম কর্ত্তব্য। জগতে শান্তি তাহার পক্ষে কল্যাণপ্রদ। সে status quo বা স্থিতিশীলতার পক্ষপাতী, কারণ একবার একটা গোলমাল বাধিলে কি হইতে কি হয় কে জানে? তাই রুশ যে পারস্য ও মোঙ্গলিয়ায় ব্যবসায় ও রাজনীতিক্ষেত্রে আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিতেছে, তাহা ইংলণ্ড অবাধে সহ্য করিতেছে; অথচ ইংলণ্ডের পক্ষে এসিয়া-ক্ষেত্রে রুশের পশ্চাতে পড়া কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু রুশ শীঘ্রই একটা কিছু করিয়া উঠিবে না সে ভয়ে ভয়ে অতি সাবধানে কাজ করিতেছে। কারণ সে জাপানের নিকট যে শিক্ষালাভ করিয়াছে সে শিক্ষা ভুলিতে পারিবে না। জাপান শুধু রুশের কেন, সমগ্র ইউরোপেরই চোখ ফুটাইয়াছে।

নব্য প্রাচ্যের ভাঙ্গাগড়া

রুশ পরাজয়ের পর হইতে এশিয়ার নবযুগ আসিয়াছে। এই নবযুগের প্রধান লক্ষণ এশিয়াবাসীর আত্মপ্রতিষ্ঠা। পারস্যদেশে রাজনৈতিকক্ষেত্রে প্রজাবৃন্দ আপনাদের অধিকার সম্রাটের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছে; তবুও সেখানে প্রজাতন্ত্র এখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। চীনে রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল; চীন এখন তিব্বতপ্রদেশ দখল করিতে প্রস্তুত। নব্য এশিয়ায় যে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে সর্ব্বত্র গতি, পরিবর্ত্তন, ভাঙ্গাগড়া ও উন্নতির লক্ষণ বর্ত্তমান। নব্য এশিয়ার ভিতর দিয়া একটা জীবন-চাঞ্চল্য বহিয়া যাইতেছে, প্রত্যেক শিরায় শিরায় জীবন স্পন্দন অনুভূত হইতেছে।

উদাহরণ—চীনের রাষ্ট্রবিপ্লব

চীন একটা ছোট দেশ নহে। আয়তনে চীন একটা ইউরোপবিশেষ। কিন্তু কি শীঘ্রই অতবড় একটা বিপ্লব সাধিত হইল। মানচুদিগের ক্ষমতা চীনসমাজে বড় কম ছিল না, আর সৈন্য সামন্ত সবই ত মানচুদিগেরই হাতে ছিল। কিন্তু যখন সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা জাগিয়া উঠিল, তখন মানচুদিগকে অবিলম্বে হটিতে হইল। চীনে যে আন্দোলন হইয়াছিল তাহা সার্ব্বজনীন, সমাজকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়া সেখানে খুব অধিক যুদ্ধ ও রক্তপাত হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস স্মরণ করিলে বুঝা যায়,—রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বে চীন-সমাজে কত বড় একটা আন্দোলন হইয়াছিল।

সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডে যে নূতন শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা সমাজকে গভীরভাবে জীবন-চাঞ্চল্যে স্পন্দিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচ্য সমাজ যে এখন সাড়া দিয়াছে, তাহা প্রাচ্যের পক্ষে মঙ্গল।

নব্য এশিয়ার বাণী

যখন প্রাচ্য জগতে রুশ ও জাপান রাষ্ট্রশক্তির তুমুল সংঘর্ষের আয়োজন চালাইতেছিল, তখন জাপানের প্রধান দার্শনিক ভাবুক ওকাকুরা 'The Ideals of the East' (প্রাচ্যের আদর্শ) গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। প্রাচ্য জগতে যখন জাপানের রাষ্ট্রশক্তির প্রাধান্য প্রমাণিত হইল, তখন ওকাকুরা প্রাচ্য সমাজের বাণী প্রচার করিলেন। যখন ইউরোপীয় সমাজ সভ্যতম সমাজ বলিয়া স্বীকৃত, যখন ইউরোপীয় সমাজ পৃথিবীর সকলদেশের সামাজিক আদর্শ নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল, তখন প্রশ্ন করিলেন,—

The west is for progress, but progress towards what? When material efficiency is complete, what end, asks Asia, will have been accomplished? When the passion for Fraternity has culminated in universal co-operation, what purpose is it to serve? If mere self-interest, where do we end the boasted advance? * * * Size alone does not constitute true greatness, and the enjoyment of luxuries does not always result in refinement. In spite of the vaunted freedom of the west, true individualism is destroyed in the competition for wealth, and happiness and contentment are sacrificed to an incessant craving for more.

তুমি সভ্য, তুমি উন্নত, তুমি ধনী, তুমি ক্ষমতাশালী, কিন্তু ততঃ কিম্? তোমার অর্থ, তোমার বিলাসিতা, তোমার সাম্রাজ্য দেখিয়াই কি তোমার উন্নতি বিচার করিব? তুমি ব্যক্তির স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছ, কিন্তু তোমার সমাজ ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বিকাশ না করিয়া উহাকে খর্ব্ব করিতেছ। অর্থপূজা ও অভাব-অর্চ্চনায় তুমি মনুষ্যের স্বাধীনতা ও প্রকৃত আনন্দ বলিপ্রদান করিয়াছ।

জাপান রুশকে হটাইয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজের প্রবল আক্রমণ হইতে জাপান রক্ষা পাইয়াছে। জাপান প্রাচ্য আদর্শ নিজ বলে বজায় রাখিয়াছে। অনেকে বলিতেছেন, জাপান ক্রমশঃ ইউরোপীয় আদর্শ

নকল করিতেছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। জাপানে বুসিদোর প্রতিপত্তি, জাপানের চিত্রকলা ও শিল্পপদ্ধতি, জাপনের সমাজ ও চিন্তার উপর বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, কনফুসিয়াসের ধর্ম্ম ও চীন সভ্যতার প্রভাব বিদেশীয়গণ ধারণা করিতে পারেন না। একজন জাপানী লেখক সম্প্রতি 'Life and Thought in Japan' 'জাপানী জীবন ও চিন্তা' নামক পুস্তকে জাপানের ভিতরকার জীবন সম্বন্ধে অনেক সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, জাপান পাশ্চাত্য আদর্শকে হজম করিতেছে, এখনও সে এশিয়া-জননীর প্রিয় পুত্রের মত তাঁহারই কোল আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে।

চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আর এক পুত্রের গৌরবে এশিয়া-মাতার মুখোজ্জ্বল হইল।

ভারতাত্মা

কিন্তু এশিয়ামাতার যে প্রিয়তম পুত্র, সে হতাশ হীনবল হইয়া এতকাল পথে পথে ভিখারীর মত কাঁদিতেছিল। অতীতের গৌরবের সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া সে ভগ্নোদ্যম। নিরাশার গভীর অন্ধকারে সে বিষাদের গান গাহিতেছিল,—

> "ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপ্নেরি ঘোর, ছিঁড়ে গেছে মোর এ বীণার তার,
> আজ এ শ্মশানে ভগ্নপরাণে কি গান আমি গাহিব আর?"

এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও শেষে দিব্য আলোক আসিল।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দিব্য দৃষ্টি

একজন তরুণ সন্ন্যাসী সেই দিব্য আলোক পাইয়াছিলেন। বাংলার পল্লীগ্রামের এক প্রান্তে দেবীমন্দিরের সামনে বসিয়া তিনি এক বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। তাঁহার দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে ভারতের এক গৌরবময় যুগ অত্যুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইল। সে আলোকে বর্ত্তমানের সমস্ত কালিমা দূর হইল। জগতে সেযুই গ আরও উজ্জ্বল ও গরীয়ান হইয়া

ফিরিয়া আসিল। ভগবান বুদ্ধবেশে নূতন মূর্ত্তিতে এই পবিত্র ভূমিতে আবার অবতীর্ণ হইলেন। বিশ্বজগতে ভারতের সেই চিরপুরাতন বাণী আবার প্রচারিত হইল। হিন্দু ও বৌদ্ধের মৈত্রী ও অহিংসামন্ত্র আবার প্রচারিত হইল। আলেকজান্দার, সীজার, অশোক, শার্লেমেন, নেপোলিয়ানের আত্মা এক বিরাট বিশ্বজয়ের সূচনায় চঞ্চল হইলেন। তাঁহারা তাঁহাদের ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধনের সুযোগ দেখিয়া আবার জগতে নূতন দেহ পরিগ্রহ করিলেন। ভারতবর্ষের পরিব্রাজক দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন। অতীত ইতিহাসে শুধু দিগ্বিজয়ী রণবীরসমূহের আত্মা নহে, খ্রীষ্টীয় সাধুগণ, মোহম্মদীয় সুফীগণ, কনফুসিয়াস প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণ, দান্তে, কান্ট, হেগেল প্রভৃতি ভাবুকগণের আত্মাও নূতন দেহ পরিগ্রহ করিয়া পরিব্রাজককে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। বিশ্বে শান্তি ও মৈত্রীর রাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন দেখিয়া তাঁহারা পরিব্রাজককে তাঁহাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। ভারতীয় পরিব্রাজকের এবার শুধু চীন, জাপান, তিব্বত, শ্যাম, কাম্বোজ, যবদ্বীপে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা নহে, এবার সমগ্র সভ্যজগৎ ব্যাপিয়া ভারতের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইল। বিশ্বসভ্যতার বাণিজ্যের পথগুলি ভারতীয় পরিব্রাজককে আহ্বান করিয়া লইল। সভ্যজগতের মুদ্রাযন্ত্রের সমস্ত শক্তি পরিব্রাজকের সহায় হইল। লণ্ডন, চীকাগো, রোম, জেনেভা, ভিয়েনা নগরীর বক্তৃতা-মঞ্চ পরিব্রাজকের চরণধূলিতে পবিত্র হইল। ভারতীয় পরিব্রাজক পাশ্চাত্য সমাজের অভ্যন্তরে পৌঁছিলেন। সেখানে দেখিলেন,—দক্ষের মহাযজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে। মহাযজ্ঞ অসীম শক্তি, অপরিসীম ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে। সেখানে অর্থ আছে, ভোগ বিলাসিতা আছে, শুধু নাই শিব মঙ্গল। ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর, বিলাসিতার মত্ততা ও ধর্ম্মের অপমানের মধ্যে শিব কল্যাণ উপেক্ষিত। শক্তির সেখানে অপমান ও লাঞ্ছনা।

পরিব্রাজক ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে চক্ষু মুদিলেন। মানসনেত্রে তিনি এক

অপরূপ ভুবনমোহন মূর্ত্তি দেখিলেন। কর্ণকুহরে অতি গম্ভীর ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সহসা সে মূর্ত্তি, সে ধ্বনি আরও পরিস্ফুট হইল,—বিশ্বের গরল কণ্ঠে ধরিয়া, মস্তকে বিশ্বসংসারের জটাভার লইয়া, ভালে চিরনবীনতার অকলঙ্ক শশী লইয়া, বম্ বম্ শব্দ করিয়া ত্রিশূলপিনাকধারী শিব আবির্ভূত হইলেন। জগতে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইল। জল স্থল আকাশ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অসংখ্য সমুদ্রপোত বিমান-পোতের কামান বন্দুক ও শেলের সংঘর্ষে মহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। জগতের মহাচিতা জ্বলিয়া উঠিল, আর সে মহাচিতায় মহারুদ্র নাচিতে লাগিলেন। মহারুদ্রের মহানৃত্যের প্রতিপদক্ষেপে বলটিক, ভূমধ্যসাগর, প্রশান্ত ও আটলাণ্টিক মহাসাগরের বিপুলকায় রণতরীগুলি খণ্ড খণ্ড, চুরমার হইতে লাগিল, মহানৃত্যের তালে তালে অগণ্য সেনানিবাস, ডকইয়ার্ড, বন্দর, মহানগরী গুঁড়াইয়া গেল, মহাজাতিসমূহের অগণ্য সৈন্যদল একনিমিষে কোথায় দলভঙ্গ হইয়া ছুটিয়া গেল। মরণের উন্মত্ত কোলাহলে চারিদিক্ মুখরিত হইল। তাহার পর শান্তি, আনন্দ, নূতন দেহ, নূতন বল, নূতন আশা।

হিন্দু সন্ন্যাসী এ দৃশ্য দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইলেন। তিনি তাঁহার জীবনে এ অলৌকিক দৃশ্য বাস্তবে পরিণত হইতে দেখেন নাই।

বিবেকানন্দ অকালে দেহত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অল্পায়ু জীবন হইতে তাঁহার জাতি নবজীবন লাভ করিয়াছে। তিনি যে উদাত্ত স্বরে ভারতবাসীকে নূতন কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিয়াছেন, সে আহ্বান ব্যর্থ হয় নাই,—

"পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, দাসসুলভ দুর্ব্বলতা এবং ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা" পরিত্যাগ করিয়া ভারতবাসী মাত্রেই আজ 'মানুষ' হইতে চাহিতেছে।

হিন্দুর আত্মপ্রতিষ্ঠা

বাস্তবিক আমাদের জাতীয় জীবনে কেবল যে পরানুবাদ পরানু-করণের আকাঙ্ক্ষা হ্রাস পাইয়াছে, তাহা নহে, কেবল ভারতের সামাজিক আদর্শ ভারতবাসীর নিকট যে আরও গরীয়ান হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের হিন্দু আদর্শ এখন জাতীয় চরিত্র গঠন ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ এখন তাহাদের সমস্ত শক্তিতে হিন্দু আচার ব্যবহার রীতি নীতি রক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেছে না, হিন্দুর বিচিত্র আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়া যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র ফুটিয়া উঠে—তাহাই ধর্ম্ম ও সমাজের উদ্দেশ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষের সমাজ আত্মরক্ষা করিতে গিয়া বুঝিয়াছে, তাহার নিকট শত্রু নিশ্চয়ই পরাজিত হইবে। ভারতীয় সামজে মূলমন্ত্র এখন আত্মরক্ষা নহে। এখন পরানুবাদ পরানুকরণের বিপদে সমাজ ত্রস্ত নহে। সমাজে এখন নূতন বল নূতন শক্তি আসিয়াছে। হিন্দু সভ্যতার আদর্শগুলি বিদেশীয় সমাজের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিবে ইহা একটা আশা নহে, একটা কল্পনা নহে,—ইহা সমাজের একটা বদ্ধমূল ধারণা। আর এই ধারণা হিন্দু সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অনুপ্রাণিত করিতেছে বলিয়া, হিন্দু চরিত্রে নূতন গুণের সমাবেশ দেখা যাইতেছে।

হিন্দুর নূতন ব্যক্তিত্বের সূচনা।

হিন্দুর ব্যক্তিত্বে নূতন গুণের আভাস কে না লক্ষ্য করিয়াছেন? বিবেকানন্দ-প্রবর্ত্তিত নর নারায়ণ পূজার মর্ম্ম কে না বুঝিয়াছেন? হিন্দুর বৈরাগ্য এখন কর্ম্মে অস্পৃহা না আনিয়া কর্ম্মপ্রবণতা আনিতেছে। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন, কর্ম্মীই প্রকৃত ভক্ত যখন তিনি আপনাকে ভগবানের যন্ত্রী ভাবিয়া কর্ম্ম করেন; যোগীই প্রকৃত ভক্ত যখন তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবৎচিন্তায় আত্মসমর্পণ করেন। এখন কর্ম্মীই

প্রকৃত ভক্ত হইয়াছেন। কর্ম্মযোগই এখন লক্ষ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষের আধুনিক বৈরাগ্য এবং মুক্তি শুধু একা আপনাকে লইয়া নহে। কবি এই নূতন প্রকার মুক্তির বাণী প্রচার করিয়াছেন,—কবি গাহিয়াছেন,—

"চাহি না ছিঁড়িতে এক বিশ্বব্যাপী ডোর
লক্ষ কোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর !"
"বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে র'ব মুক্তি-সমাধিতে ?"

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু-হৃদয়ের ভিতর হইতে এই প্রশ্ন এখন উত্থিত হইয়াছে। "অনন্ত জগৎভরা দুঃখ শোক" থাকিতে ভক্ত শুধু আপনার ক্ষুদ্র আত্মা লইয়া জগতের পানে বিমুখ হইয়া যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় চাহিয়া থাকিবে, আধুনিক হিন্দুর ব্যক্তিত্ব তাহা চাহে না। নৈতিক দুর্ব্বলতা, বহির্মুখী প্রবৃত্তির প্রাবল্য অথবা প্রকৃত 'বৈরাগ্যের' অভাবের জন্য যে এই প্রকার পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে, তাহা নহে। আমাদের সমাজে এখন একটা সর্ব্বাঙ্গীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের সূচনা হইতেছে বলিয়া এই নূতন তত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।"

সমগ্র সমাজ আরও কঠোর বৈরাগ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াছে বলিয়া সমস্ত বন্ধনকে সে আলিঙ্গন করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার খুলিয়া সে মুক্তির আনন্দ লাভের প্রত্যাশী—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি—সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণ-গন্ধময় ! প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার !
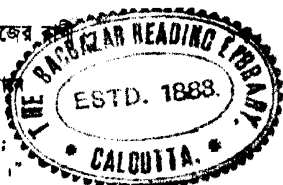
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া ;
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।"

গৃহ সংসার, পিতামাতা, মিত্র পরিবার, সমাজ—তখন বন্ধন নহে ইন্দ্রিয়ের সুখদুঃখভোগ, মোহ নহে ; তখন

"দেবতারে মোর আত্মীয় জানি আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদের এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি,
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালী হিয়ার অমিয়া মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া"

শুধু ক্ষুদ্র সংসার সমাজ কেন, সমস্ত বিশ্বভুবন প্রেমের টানে ধরা দেয়।

"এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়,
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়,
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে ;—সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে,
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী—জন্মমৃত্যু সমুদ্র দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাটায়।
করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান্।
সেই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজ করিছে নর্ত্তন।"

রবীন্দ্রনাথ, বৈরাগ্যের নহে, প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার গীতাঞ্জলির একমাত্র সুর এই

"ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন গাহিস্ ওরে?
*　　*　　*　　*

কর্ম্মযোগে তার সাথে এক হয়ে
ধর্ম্ম পড়ুক ঝরে।"

নর-নারায়ণের পূজা

নর-নারায়ণ-পূজা-প্রবর্ত্তক বিবেকানন্দ তাঁহার অমোঘ কণ্ঠে বলিয়াছেন,—

"শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর এক তরী করে পারাপার
—মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন বিজ্ঞান
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম, প্রেম প্রেম এই মাত্র ধন।
হয় বাক্যমন-অগোচর, সুখে দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা মাতৃভাবে তাঁরি আগমন।
ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

বিবেকানন্দ বুঝাইয়াছেন, বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির নিকট আত্মা বলিতে জীবাত্মা বুঝায় না, কিন্তু সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী সকলের আত্মারূপে অবস্থিত সর্ব্বেশ্বর বুঝিতে হইবে। যখন জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন, তখন জীবের সেবা ও ঈশ্বরে প্রেম দুই একই। জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয় তাহা প্রেম। আমাদের অবলম্বন—প্রেম; দয়া নহে। আমরা দয়া করি না, সেবা করি। কাহাকেও দয়া করিতেছি, এ অনুভব আমাদের নাই, তাহার পরিবর্ত্তে আমরা সকলের মধ্যে প্রেমানুভূতি ও আত্মানুভব করিয়া থাকি।

বিবেকানন্দ এই বৈরাগ্যরূপ প্রেমানুভবের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। ইহারই উপর তাঁহার নর-নারায়ণ-পূজা প্রতিষ্ঠিত। বিবেকানন্দ আমাদিগকে গরীবের জন্য, দুঃখীর জন্য, পাপীর জন্য কাঁদিতে শিখাইলেন। তিনি দেখাইলেন, ভগবান নারায়ণ দুঃখী, পাপী, তাপী, গরিব

সাজিয়া আমাদের নিকট কৃপা চাহিতেছেন। আর আমরা এতকাল তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। তিনি ভিখারী সাজিয়া আমাদের দেব-মন্দিরে আসিয়া ভক্ত পুরোহিতের নিকট বসিয়া কাতর কণ্ঠে কহিতেছেন,

"গৃহ মোর নাই
এক পাশে দয়া করে দেহ মোরে ঠাঁই।"

আর আমরা দেবতার নিকট জপমালা জপিতে জপিতে তাঁহাকে বলিয়াছি,

"আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে!"
সে কহিল, "চলিলাম।"—চক্ষের নিমিষে
ভিখারী ধরিল মূর্ত্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, ""প্রভু মোরে কি ছল ছলিলে"
দেবতা কহিল, "মোরে দূর করি দিলে!
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে!"

দেবতা চলিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তিনি মন্দিরে আবার আসিয়াছেন। আমাদের সমাজের দরিদ্র, নীচ, মূর্খ, নিরক্ষর নির্যাতিতদের সেবা আরম্ভ হইয়াছে।

বিবেকানন্দের নর-নারায়ণ পূজা আজ ভারতবাসীর পূজা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ভারতবাসী আজ বলিতে শিখিয়াছে, "আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী।"

হিন্দুসমাজের ক্রমবিকাশের মূলমন্ত্র

প্রাচীনকালে হিন্দুর ব্যক্তিত্ব বিভিন্নভাবে বিকাশলাভ করিয়াছিল। প্রাচীনকালের হিন্দু ঋষিগণ আমাদের সমাজকে বিভিন্ন আশ্রমে ও জাতিতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহিত গোষ্ঠীজীবনের সমন্বয়

বিধান করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দুসমাজে গোষ্ঠীর প্রভাব যেরূপ প্রবল হইয়াছিল, অন্য কোন সমাজে তাহা হয় নাই। অথচ গোষ্ঠীপ্রভাবের প্রাবল্য হেতু হিন্দুর ব্যক্তিত্বের খর্ব্ব হয় নাই। কারণ হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্র সমাজ নহে—ব্যক্তি। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের চরমবিকাশ, মুক্তি,—গৃহ, সংসার, সমাজের বন্ধন হইতে মুক্তি। সমাজ ব্যক্তিকে নানা কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়া বাঁধিয়া রাখিতেছে, অপরদিকে ধর্ম্ম তাহাকে বৈরাগ্যের কথা শুনাইয়া মুক্তির পথ প্রশস্ত করিতেছে। এইরূপে হিন্দুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ-লাভ করিয়াছিল।

প্রাচ্য সমাজের ক্রমবিকাশের মূলমন্ত্র

পাশ্চাত্য জগতের নৈতিক ব্যবস্থা ঠিক বিপরীত। পাশ্চাত্য জগতে সমাজই ব্যক্তির প্রভাব বিস্তারের প্রধান সহায়। সমাজ ব্যক্তিকে পূজা করিতেছে। তাহার বিনিময়ে সমাজের নিকট ব্যক্তির কিছু দেয় নাই। এমন কি, সমাজ অনেক সময়ে সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যক্তিত্ববিকাশের সুযোগ প্রদান করিয়া থাকে। শুধু সামাজিক ব্যবস্থা নহে, সেখানকার আধুনিক দর্শন বলিতেছে, মনুষ্যের প্রতিযোগিতার দ্বারাই ব্যক্তিত্বের পুষ্টিসাধন হয়। সমর্থের জয়লাভ ও অক্ষমের বিনাশ না হইলে, সমাজের উন্নতি অসম্ভব, ইহাই সেখানকার ধারণা। সমাজ আপনার পদে নিজেই কুঠারঘাত করিতেছে। ধর্ম্ম, যীশুখৃষ্টের সেবার ধর্ম্ম, পাশ্চাত্য সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতাকে খর্ব্ব করিয়া, ব্যক্তিকে গোষ্ঠীর নিকট বশ্যতা স্বীকার করাইয়া লইয়াছিল; কিন্তু ফরাসীবিপ্লবের নেতারা যখন খৃষ্টকে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া বুদ্ধিকে বরেণ্য বলিয়া মনোনীত করিলেন, তখন হইতে পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীপ্রভাব যে আবার প্রবল হইবে সে আশা গিয়াছে।*

---

* If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar."
"Love thy neighbour as thyself,"—
ইহা ত আর ইউরোপ গাহিতেছে না। টলষ্টয় খৃষ্টকে The greatest of socia-

এজন্য সম্প্রতি পাশ্চাত্য জগৎ নূতন মূলমন্ত্র গ্রহণ করিয়া আপনার সমাজ পুনর্গঠন করিতে প্রয়াসী। সমাজে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহিত অসংযম ও স্বৈরাচার প্রভৃতি ব্যাধি প্রবল হইয়াছে। বিপ্লববাদীর সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আশা আজ নির্মূল। খৃষ্টপ্রচারিত প্রেম ভোগের প্রবৃত্তিকে ও অনৈক্যের অত্যাচারকে দমন করিতে পারে নাই।

হিন্দুসমাজতন্ত্রে প্রতিযোগিতা দমন—বর্ণধর্ম্ম প্রতিযোগিতা ও অধিকারভেদের সমন্বয়

হিন্দুসমাজ বর্ণ ও জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়া সমাজকে প্রতিযোগিতার কুফল হইতে রক্ষা করিয়াছিল. হিন্দুসমাজে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা বর্ণ ও জাতির মধ্যে আবদ্ধ থাকিত। সমাজের ছোট ছোট কর্ম্মকেন্দ্রের মধ্যে থাকিয়া ব্যক্তি পরস্পরের প্রতিযোগী হইত। হিন্দুসমাজেও প্রতি-যোগিতা ছিল, জীবনসংগ্রামে সক্ষমের জয়, অক্ষমের পরাজয় ছিল। কিন্তু জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্র সমগ্রসমাজব্যাপী ছিল না, সমাজের এক ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই জীবনসংগ্রাম চলিত। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের প্রতিযোগী; অন্যবর্ণের সহিত ব্রাহ্মণের প্রতিযোগিতা ছিল না। হিন্দুব্রাহ্মণের প্রতিযোগিতা ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং এই কারণেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণবর্ণের যাহা বিশিষ্টগুণ—সাত্ত্বিকভাব ও আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন হইত। এরূপে ক্ষত্রিয়গণের ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে রাজসিক ভাব ও শৌর্য্য, এবং বৈশ্যগণের বৈশ্যবর্ণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে রাজসিক ভাব ও শিল্পব্যবসায়কুশলতার অনুশীলন হইত।

. সমাজের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যেও যে আদান প্রদান আদৌ ছিল না,

lists বলিয়াছিলেন। The end of the commandments is charity out of a pure heart and of a good conscience। কিন্তু খৃষ্টের সমাজসেবামূলক ধর্ম্ম, সেবার ধর্ম্ম, পাশ্চাত্য জগৎকে আর অনুপ্রাণিত করিতে পারিতেছে না।

তাহা বলা যায় না। সমাজ যখন রাষ্ট্রশক্তি হইতে বঞ্চিত হয় নাই, "নৃপস্য বর্ণাশ্রমপালনং যৎ, স এব ধর্ম্মো মনুনা প্রণীতঃ," দেশের রাজা যখন সমাজধর্ম্ম পালন করিতেন, তখন কোন ব্যক্তি অসাধারণ প্রতিভাবলে একবর্ণ হইতে উচ্চবর্ণের অধিকার লাভ করিতে পারিত।

কৌলীন্য-বিদ্যা (হিন্দু Eugenics)

হিন্দুর অধিকারভেদের মূল ভিত্তি এই – এক জন্মের শিক্ষা ও সংস্কার অপেক্ষা স্বভাব ও জন্মাধিকারই কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সূচনা করে। আধুনিক ইউরোপে সুপ্রজনন-বিদ্যা (Eugenics) খুব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। সুপ্রজনন-বিদ্যার মূলতত্ত্ব ইহাই। কার্লপীয়র্সনের ভাষায় আমরা হিন্দুর এই ধারণা সম্বন্ধে বলিব, Heredity is more important than the environment, আবেষ্টন অপেক্ষা জন্মাধিকার বলবত্তর। প্রাচীন হিন্দুগণ হিন্দু সমাজকে এই বিশ্বাসেই বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ভাগের এক একটি বিশিষ্ট গুণ তাঁহারা দেখিয়াছিলেন এবং এক একটি বিভাগের অনুবর্ত্তী ব্যক্তিগণের প্রতিযোগিতার ফলে ঐ বিশিষ্ট গুণের অনুশীলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু এক বিভাগের ব্যক্তির সহিত অপর বিভাগের কোন ব্যক্তির প্রতিযোগিতা তাঁহারা নিবারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সুপ্রজনন-বিদ্যার সারটুকু অবলম্বন করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে এরূপ প্রতিযোগিতা নিষ্ফল। ইহা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুবিধা বিধান করে না। উপরন্তু সমগ্র সমাজে অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার ফলে সমাজ হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতি দোষ বৃদ্ধি পায়। "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।" স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে। "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।" স্বধর্ম্ম হীন হইলেও পরধর্ম্ম অপেক্ষা ভাল, কারণ উহা "স্বভাবনিয়ত,"—স্বভাবনির্দ্দিষ্ট, পূর্ব্বজন্ম-সংস্কারের ফল। ঐ-সকল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুগণ যাহাতে বিভিন্ন ধর্ম্মবৃত্তি

পরস্পর মিশ্রিত না হয় তাহার তত্ত্বাবধানের ভার রাজার উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

হিন্দুসমাজ বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যে শুধু প্রতিযোগিতা দমন করিয়াছিল তাহা নহে। উহাদিগের সহযোগিতারও ব্যবস্থা বিধান করিয়াছিল। প্রত্যেক বর্ণ অপর বর্ণের সাহায্যেই স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া উন্নতি লাভ করিত, একের উন্নতি অপরের উন্নতির উপর নির্ভর করিত। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের সূত্র, each for all and all for each, প্রত্যেকেই সকলের জন্য, এবং সকলেই প্রত্যেকের জন্য, আমাদের সমাজেই যথোচিত অবলম্বিত হইয়াছিল। সমাজে যাহাদের উচ্চতম অধিকার তাহাদের একমাত্র ধর্ম্ম ছিল,—সকলের হিতসাধন; একমাত্র গুণ ছিল—মৈত্রী। এরূপে হিন্দুসমাজ বর্ণ ও অধিকার ভেদ সৃষ্টি করিয়া প্রতিযোগিতার কুফল হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া বর্ণ ও জাতির ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে প্রতিযোগিতার উৎসাহ দিয়া ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথ মুক্ত রাখিয়াছিল। সমস্ত সমাজ ব্যাপিয়া জীবনসংগ্রাম চলিলে প্রতিযোগিতার কুফল অবশ্যম্ভাবী তাহা আমাদের ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন; তাই তাঁহারা প্রতিযোগিতাকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায় জানিয়া উহাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু উহাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া যথোচিত নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন।

আশ্রম ও পরিবারধর্ম্মে অনৈক্যের অত্যাচার নিবারণ

হিন্দু সমাজের প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা ছিল তাহাও যথোচিত নিয়ন্ত্রিত হইত। হিন্দুর পরিবার ও আশ্রমধর্ম্মও উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের অতি সুন্দর উপায় ছিল। হিন্দুসমাজে প্রতিযোগিতা ব্যক্তিগত ছিল না। একান্নবর্ত্তী পরিবারের জন্য প্রতিযোগিতা পরিবারগত ছিল। এবং একারণে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় যে হিংসা বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা

লক্ষিত হয়, তাহা হইতে আমাদের সমাজ অনেক পরিমাণে মুক্ত ছিল। ইহা ছাড়া একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস হিন্দু সমাজে ব্যক্তির স্বৈরাচার নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল। আশ্রম ধর্ম্ম, হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম অনন্তবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। সংসার ত দু দিনের জন্য, প্রতিযোগিতাই বা ক'দিনের জন্য ?

অসার-সংসার-বিবর্ত্তনেষু
মা যাত তোষং প্রসভং ব্রবীমি।

ইহাই হিন্দুর বাণী।

"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুতমিতরমণীসমাজে।"

এই বৈরাগ্যবোধ একটা সংসারের অনুষ্ঠানে মূর্ত্তি পাইয়া সমাজে সজীব ছিল। দিন কতক খুব প্রতিযোগিতা, তাহার পর আশ্রম পরিবর্ত্তন, তখন প্রতিযোগিতার চিন্তা একেবারেই দূর হইবে। সংসারযাত্রায় যদি একটা নিয়ম বা আদর্শ থাকে যে পঞ্চাশ বৎসর পরে নিজ সংসারের যেমন অবস্থাই থাকুক না কেন উহা হঠাৎ ছাড়িয়া বনে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে তাহা হইলে সংসার-যাত্রাটা বেশ সহজ, সুন্দর হয়।

শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিনাম্।
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তিনাম্ যোগেনান্তে তনুত্যজাম্।

সংসারের দৈনন্দিন জীবনে হিংসা বিদ্বেষ মারামারি কাটাকাটি থাকে না; এরূপ থাকিলে ভোগের সংসারও আনন্দময় হয়, সংসার-যাত্রায় কঠোর বৈরাগ্যবোধ থাকিলে ব্যথিত প্রাণে কাঁদিতে হয় না—

"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া চলিব
তোমারি রসাল নন্দনে।
কবে তাপিত এ দেহ করিব শীতল
তোমার করুণা চন্দনে।
ভবের সুখ দুখ চরণে দলিয়া
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া;
চরণ টলিবে না হৃদয় গলিবে না
কাহারও আকুল ক্রন্দনে।

আশ্রমধর্ম্মে সাম্যবাদ

আশ্রমধর্ম্ম হিন্দুসমাজে আরও একটা সুন্দর ফল দিয়াছিল। বর্ণধর্ম্মের ভিত্তি,—অধিকারভেদ। বর্ণধর্ম্মের ফল, প্রতিযোগিতার গণ্ডীকে ছোট করিয়া দেওয়া, প্রতিযোগিতা নিবারণ নহে। ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ব্যক্তির প্রতিযোগিতা আবদ্ধ থাকিলে, ব্যক্তির চিন্তা ও কর্ম্মের স্বাধীনতা লোপ পাইতে পারে, বর্ণানুমোদিত ক্রিয়াকর্ম্ম বন্ধন বলিয়া ঠেকিতে পারে। বর্ণধর্ম্মের এই দোষ আশ্রমধর্ম্ম নিবারণ করিয়াছিল। আশ্রমধর্ম্ম বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে মোক্ষলাভের আদর্শ জাগাইয়া রাখিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলেই মোক্ষলাভের জন্য প্রস্তুত হইবে,—কিন্তু বিভিন্ন ভাবে ও প্রকারে স্বভাবনিয়ত স্বধর্ম্মে ক্রিয়াবান হইয়া সেই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হইবে। ব্যক্তি যখন সমাজের ভিতর, তখন প্রত্যেকের বিভিন্ন কর্ত্তব্য ভিন্ন ভিন্ন অধিকার, তখন অনৈক্য ;—কিন্তু ব্যক্তি যখন বর্ণ ও সমাজের বাহিরে, ভগবানের সম্মুখীন, তখন ঐক্য ছিল। বানপ্রস্থ ও যতি আশ্রমে বর্ণ-ধর্ম্মের অনৈক্য ছিল না, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলেরই সমান অধিকার ছিল, সকলেই সমাজ হইতে সমান শ্রদ্ধা পাইত। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বানপ্রস্থাবলম্বীর নিকট ব্রাহ্মণকুমারের শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণের কোন বাধা ছিল না। হিন্দুসমাজ রুশোর ঐক্যমন্ত্র 'all men are born equal' "সকল মানুষ জন্মতঃ সমান" অবলম্বন করে নাই। হিন্দুর অধিকারভেদ অনৈক্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ অনৈক্য সমাজসৃষ্ট, অস্বাভাবিক, কৃত্রিম নহে। এ অনৈক্য স্বাভাবিক,—জন্মাধিকারের বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু হিন্দু সমাজ বলিয়াছিল, all men are made equal, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য সকলেই আপনাদের বিশিষ্ট ধর্ম্মের ক্রিয়াকর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ হইলে, শেষ বয়সে সমান অধিকার পাইবে,—বানপ্রস্থ বা যতির অধিকারে সকলেই সমগ্র সমাজের নিকট হইতে ভক্তি ও শ্রদ্ধা পাইবে।

এরূপে হিন্দুর বর্ণ-ধর্ম্ম প্রতিযোগিতাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া যথোচিত নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল; হিন্দুর আশ্রমধর্ম্ম প্রতিযেগিতা নিবারণের কুফল হইতে সমাজকে রক্ষা করিয়াছিল।

বিবর্ত্তনবাদের ব্যক্তিপূজা ও প্রতিযোগিতা-মন্ত্র

ইউরোপের আধুনিক ভাবুকগণ প্রতিযোগিতার কুফল এখন বেশ বুঝিয়াছেন। এতই তাঁহারা চিন্তিত হইয়াছেন যে তাঁহারা প্রতিযোগিতার প্রতিরোধ করাই সমাজের একমাত্র ধর্ম্ম মনে করিতেছেন। অথচ এতকাল ইউরোপীয় দার্শনিকগণ একবাক্যে বলিয়া আসিতেছিলেন, প্রতিযোগিতা ভিন্ন সমাজের উন্নতি একেবারেই অসম্ভব।

ডারউইন বিশেষ স্পষ্টভাবে মনুষ্যসমাজ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। তবুও তিনি বলিয়াছেন সমাজের উন্নতি ব্যক্তির প্রতিযোগিতার উপরই নির্ভর করে। আবেষ্টনের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে প্রতিযোগী জাতিসমূহের মধ্যে যে সক্ষম হয় সেই জগতে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে। বাইজম্যান (Wiesmann) কিন্তু স্পষ্ট বলিয়াছেন

The progress of Society depends upon the intensity of rivalry and competition. Without natural selection degeneration must set in by the principle of *panmixia.*

অধ্যাপক হেকেলের একই মত—

The cruel and relentless struggle for existence which rages through all living creatures...the picking out of the chosen, the survival of the minority of the privileged fit and the death of the majority of the competitors.

অধ্যাপক অস্কার স্মিট (Oscar Schmidt) বলিতেছেন, সমাজতন্ত্রবাদীরা প্রতিযোগিতার প্রতিরোধ করিয়া সমাজের উন্নতির পথ রোধ করিতেছে।

The Socialists choke the doctrine of descent.

হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) বলিয়াছেন,

The absence of the beneficent working of the survival of the fittest will lead to degeneration ; for no society can hold its own in the struggle with other societies if it disadvantages its superior units that it may advantage its inferior units.

বেঞ্জামীন কীড (Benjamin Kidd) সোজাসুজি প্রতিযোগিতা-কেই জীবজগতের একমাত্র উন্নতির সোপান বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

All progress from the beginning of life has been the result of the most strenuous and imperative conditions of rivalry and selection. Without this struggle degradation must set in.

সকলেই বলিতেছেন সমাজে প্রতিযোগিতা থাকিলেই সক্ষমের জয়লাভ ও অক্ষমের বিনাশ হইবে। যে সমাজে প্রতিযোগিতা নাই, সেখানে অক্ষমেরা সক্ষমদিগের নিকট হইতে তাহাদের ন্যায্য অধিকারের ভাগ লইবে। সক্ষমেরা একারণে দুর্ব্বল হইবে। শেষে সমগ্র সমাজ অন্য-দেশের সমাজের সহিত জীবনসংগ্রামের প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইবে। সমাজের ভিতরে বা বাহিরে প্রতিযোগিতাই উন্নতির একমাত্র পথ। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। এ পথ ত্যাগ করা মহাপাপ।

অধ্যাপক হক্সলী তাঁহার রোমেন্স (Romanes) বক্তৃতায় চরমপন্থী না হইয়া একটা মাঝামাঝি পথ লইয়াছিলেন।

Social progress means a checking of the cosmic process at every step (i. e. of the struggle of individual with individual) and the substitution for it of another called the ethical process.

প্রতিযোগিতা বন্ধ হইলে যে সমাজের অবনতি হইবে, তাহা তিনি বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, মানুষের নৈতিকজীবন জীবজগতের প্রতি-যোগিতার নিয়মকে প্রতিরোধ করিয়েছে। তবুও তিনি সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না,—তিনি লিখিয়াছেন,—

Socialism wars against natural equality and sets up an artificial equality in place of a natural order.

রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যক্তিপূজার পরিণাম

ইউরোপ এখন এসব মত আর চাহে না। প্রতিযোগিতার নিয়ম ইউরোপ আর মানিতে চাহে না। ব্যক্তির প্রভাবকে ইউরোপ এখন খর্ব্ব করিতেছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে ইউরোপের প্রজাতন্ত্র এতকাল ব্যক্তিকেই পূজা করিয়াছে, তাহার স্বাভাবিক অধিকারের নিকট রাষ্ট্র মস্তক অবনত করিয়া বসিয়াছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যক্তির প্রভাবের চূড়ান্ত আমরা ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে দেখিতে পাই। কিন্তু রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যক্তি যদিই প্রধান হয়, ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর যদি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে, রুশোর মতানুযায়ী যদি রাষ্ট্র একটা ব্যবসায় বা কারবারের মত দলিল বা চুক্তির ফলে সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে একদিন না একদিন রাষ্ট্র ব্যক্তির নিকট আবশ্যক বলিয়া বোধ হইবে না। উপরন্তু রাষ্ট্রই অনর্থের মূল বলিয়া অনুমিত হইবে। তাহাই এখন হইয়াছে। ইউরোপে এনার্কিষ্ট ও নিহিলিষ্টদিগের সংখ্যা বড় কম নহে। রাষ্ট্রই যত অমঙ্গলের মূল, ইহা অনেকে বলিতে শিখিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যক্তি-পূজার পরিণাম আমরা দেখিলাম।

বৈষয়িক জীবনে ব্যক্তিপূজার পরিণাম

বৈষয়িক জীবনে ব্যক্তিপূজা ও প্রতিযোগিতার মন্ত্র উচ্চারণের পরিণাম আরও ভীষণ হইয়াছে। প্রতিযোগিতার ফল অনৈক্য। অনৈক্যের ফল স্বৈরাচার। প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া মুষ্টিমেয় ধনী সম্প্রদায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মের সেবাব্রতের মহিমা কমিয়াছে। অসংখ্য শ্রমজীবী আহার্য্য ও বস্ত্রাভাবে প্রপীড়িত, অথচ ধনীদিগের ভ্রূক্ষেপ নাই। কার্ণেগী পিয়ারপাণ্ট মর্গান, রকফেলার বৈষয়িক জীবনে ব্যক্তির প্রভাবের চূড়ান্ত নিদর্শন। কিন্তু সমাজে এরূপ ধনী কয় জন? শ্রমজীবীগণের অভাবের অভিযোগে ধনীগণ কর্ণপাত করিতেছেন না। পাশ্চাত্য জগতের বৈষয়িক

জীবন এখন ঘোর অশান্তিতে পরিপূর্ণ। বৈষয়িক জীবনে ব্যক্তিপূজার পরিণাম আমরা দেখিলাম।

আধুনিক বিবর্ত্তনবাদ ও প্রতিযোগিতা দমন

ইউরোপ তাই আর ব্যক্তিপূজা করিতে চাহে না। ইউরোপ প্রতিযোগিতা দমন করিতে প্রত্যাশী। ফরাসীবিপ্লবের পর হইতে ইউরোপ ধর্ম্মের উপর আস্থা হারাইয়াছে। ধর্ম্মের উপর প্রতিযোগিতা দমনের ভার না দিয়া সেখানকার সমাজই ব্যক্তির প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিতেছে। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের আশা যে তাঁহারা ব্যক্তির জীবন গঠন করিয়া সমাজকে অশান্তি হইতে রক্ষা করিবেন, প্রতিযোগিতার জন্য সমাজ যে অনর্থক শক্তি ব্যয় করিতেছে, তাহা নিবারণ করিয়া সমাজকে আরো সবল করিবেন। যে সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যক্তিত্ব এতকাল প্রতিযোগিতার ফলে বিকাশ লাভ করিয়া সমাজ-বন্ধন শিথিল করিতেছিল, তাহার পরিবর্ত্তে এক সর্ব্বাঙ্গীন ব্যক্তিত্ববিকাশের পথ মুক্ত করিয়া দিবেন। কার্লমার্ক্স্ লাসাল হইতে আরম্ভ করিয়া এডওয়ার্ড বেলামী, এইচ, জি, ওয়েলস্ পর্য্যন্ত সকলেই সহযোগিতাকেই সমাজের উন্নতির একমাত্র উপায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অধ্যাপক কার্লপায়র্সনের ভাষায়—

The progress of modern societies must depend upon the reduction of the waste due to extra-group rivalry and competition, the lessening of which will strengthen them against extra-group stress and lead to uniform distribution of powers over the community.

সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা কমিয়া আসিলে সমাজের শক্তি অধিক হইবে এবং অন্য জাতির সহিত জীবন-সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় উহার অধিক সুবিধা হইবে। Prince Kropotkin (ক্রপটকিন) জীবজগৎ হইতে দেখাইয়াছেন প্রতিযোগিতা নহে, সহযোগিতা, Mutual Aid and Association, উন্নতির একমাত্র কারণ।

আধুনিক ইউরোপে হিন্দুসমাজতন্ত্রের পদ্ধতি অবলম্বন।

ভারতবর্ষে সমাজ যেমন এতকাল বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও অধিকারভেদ সৃষ্টি করিয়া ব্যক্তির জীবন গঠন করিতেছিল, পাশ্চাত্য সমাজ ঠিক সেইরূপে এখন ব্যক্তির জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিতেছে। ইউরোপ হিন্দুসমাজের ক্রমবিকাশের মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতেছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম নহে, সমাজতন্ত্রই ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিবে—আধুনিক ইউরোপের ইহাই আশা।

হিন্দু ও পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্র

কিন্তু ভারতবর্ষে যেরূপ সমাজতন্ত্র ছিল এবং এক্ষণে ইউরোপ যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, তাহাতে অনেক প্রভেদ। ইউরোপের শ্রমজীবিগণ অনেক সময়ে সমাজতন্ত্রবাদিগণ কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া একটা ভীষণ সামাজিক বিপ্লবের জন্য আয়োজন করিতেছে। তাহাদের আশা, ধনীগণের অর্থ লুট করিয়া রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করিয়া তাহারা নিজেরাই আইন-কানুন করিবে। ধনীগণের অর্থ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলে সমাজে দুঃখদারিদ্র্য থাকিবে না। তাহারা মুখে বলিতেছে, সহযোগিতাই মনুষ্যের ধর্ম্ম; তাহারা প্রচার করিতেছে, প্রত্যেকে সকলের জন্য এবং সকলে প্রত্যেকের জন্য; কিন্তু কাজে তাহারা তস্কর দস্যুর ন্যায় স্বার্থপর—সমাজদ্রোহী।

আবার সেই ব্যক্তির প্রভাবের পরিণাম। রাষ্ট্রজীবনে যাহা এনার্কিজ্‌ম্ ও নিহিলিজ্‌ম্, সমাজক্ষেত্রে তাহাই এই লুণ্ঠনপ্রবৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। সেই একই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, যাহা দমন করিতে ইউরোপ এত সাধ্য-সাধনা করিতেছে।

Socialist propaganda carried on as a class war suggest none of those ideals of citizenship with which socialist literature abounds, 'each for all, and all for each,' and so on. It is an appeal to individualism (which seems to be an euphemism for envy and cupidity)

and results in getting men to accept socialist formulae without becoming socialists. (Macdonald, Socialism and Society.)

পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিত্ববিকাশের প্রতিরোধ

কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে অনেকে বিজ্ঞ ও প্রকৃত ভাবুক আছেন। তাঁহারা সমাজে নূতন প্রেম, সদ্ভাব ও ভাবুকতার স্রোত আনিতে চাহিতেছেন। তাঁহারা মনুষ্যের অধিকার প্রচার করেন না, তাঁহারা বিপ্লবের পক্ষপাতী নহেন। সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী সমাজকে শুনাইয়া তাঁহারা আধুনিক ইউরোপের ব্যক্তির প্রভাবকে কমাইতে চাহিতেছেন, ব্যক্তির প্রভাবকে যথোচিত নিয়ন্ত্রিত করিতে তাঁহারা প্রত্যাশী। তাঁহাদিগের সমাজতন্ত্রবাদের সহিত হিন্দুসমাজতন্ত্রবাদের সাদৃশ্য আছে। তাঁহারা সত্য সত্যই ব্যক্তির প্রভাব নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের মতে—

"Socialism is merely individualism rationalised. organised, clothed and in its right mind". [The Fabian Society Papers].

কিন্তু উদ্দেশ্য এক হইলেও উভয়ের প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

হিন্দুসমাজতন্ত্রে নেতা ছিলেন ব্রাহ্মণগণ, যাঁহাদিগের প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যেই একটা অনন্তবোধ ও অসীমে প্রীতির চিহ্ন থাকিত; যাঁহারা সংসারের সমস্ত বন্ধনের ভিতর থাকিয়াও আপনাদের মুক্তিসাধনের জন্য সদা সচেষ্ট থাকিতেন; যাঁহাদিগের নিকট মুক্তিসাধন চরম লক্ষ্য; যাঁহাদিগের নিকট ভোগের সংসার, বৈরাগ্য সাধন ও মুক্তিলাভের উপায়-মাত্র ছিল। ব্রাহ্মণগণ ব্যক্তির মুক্তিসাধন,—ব্যক্তিত্ববিকাশই সমাজ-জীবনের চরম উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা যে সমাজতন্ত্র গঠন করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐক্য ছিল, অনৈক্যও ছিল; সহযোগিতা

ছিল, প্রতিযোগিতাও ছিল; সাম্য ছিল, অধিকারভেদও ছিল; তাহাতে অনৈক্য ছিল কিন্তু স্বৈরাচার ছিল না; তাহাতে প্রতিযোগিতা ছিল কিন্তু বিদ্বেষ ছিল না; তাহাতে অধিকারভেদ ছিল কিন্তু নির্য্যাতন ছিল না। তাহাতে ব্যক্তির প্রভাব নিয়ন্ত্রিত হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধনও হইত।

আধুনিক ইউরোপের সমাজতন্ত্রের নেতা হইবেন—বিষয়ী শ্রমজীবী-দিগের সর্দ্দারগণ। তাঁহাদের অনন্তবোধ নাই, তাঁহাদের দৃষ্টি সসীমের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে যে বিশ্ববিজয়িনী শক্তি সুপ্ত আছে, তাহার পরিচয় তাঁহারা পান নাই। তাই তাঁহারা ব্যক্তির প্রভাব কমাইতে যাইয়া একেবারে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ রোধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম আইন-কানুন সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা বক্তির স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে যাইতেছেন, সকল ব্যক্তিকেই একই অলঙ্ঘনীয় নিয়মের অনুবর্ত্তী করাইয়া তাঁহারা এক ছাঁচে সমস্ত লোককে গড়িতে যাইতেছেন। তাঁহাদের সমাজতন্ত্র প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশ-সাধনের অন্তরায় হইতেছে।

পাশ্চাত্য জগতে আধুনিক সমাজ ব্যক্তিত্বের প্রভাব দমন করিতে যাইতেছে। হিন্দুসমাজ প্রতিযোগিতা ও অধিকারভেদের সমন্বয়সাধন করিয়া যেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করিয়া ব্যক্তিত্ববিকাশের পথ মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্য সমাজ পারিতেছে না, কখনও পারিবে না। হিন্দুর অনন্তবোধ না থাকিলে পারিবে না। হিন্দুর অহিংসা, মৈত্রী, করুণা না থাকিলে পারিবে না। হিন্দুর ব্যক্তিত্বপূজা, "মানুষের ঠাকুরালি", না থাকিলে পারিবে না। হিন্দু কি কখনও পাশ্চাত্য দেশবাসীকে এই অনন্তবোধ, এই অহিংসা ধর্ম্ম, এই "মানুষের ঠাকুরালি" শিক্ষা দিতে পারিবে না?

হিন্দুসমাজ-বন্ধনের শৈথিল্য

আধুনিক হিন্দু ইহা কি একবার ভাবিয়া দেখিবেন না? আধুনিক হিন্দুসমাজের হীন অবস্থা কে না লক্ষ্য করিয়াছেন? আমাদের সমাজবন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে। আমাদের বর্ণাশ্রম একান্নবর্ত্তীপরিবারধর্ম্ম হীনবল অথবা মৃত। গুণকর্ম্মবিভাগের উপর আমাদের বর্ণ-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু যে-সমস্ত গুণ ও কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে সমাজে ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা ও সম্মান নির্ভর করিত, তাহাদের আদর আজ হ্রাস পাইয়াছে। বর্ণ-ধর্ম্ম তখন হইতেই মৃতপ্রায়। তবুও এখনও কি আমাদের সমাজে অধ্যাত্মিকতার আদর্শ গরীয়ান্ নহে, এখনও কি সাদাসিধে চালচলন ও উচ্চচিন্তার আদর্শে আমরা জীবন-গঠন করি না? আমাদের সমাজে এখনও বিদ্যার আদর ও বৈরাগ্যের সম্মান অটুট রহিয়াছে। কোন লোক বড় কি ছোট তাহা বিচার করিতে গেলে আমরা তাহার অর্থ বা পদ দেখি না, তাহার চরিত্র ত্যাগবল দেখিয়াই তাঁহাকে বড় বা ছোট বলি। বর্ণ-ধর্ম্মের মূলমন্ত্র আমরা ছাড়ি নাই। কখনও ছাড়িতে পারিব না। বর্ণ-ধর্ম্মের সহিত আশ্রমধর্ম্মও জীবন হারাইয়াছে। তবুও এখনও কি আমাদের বাটীর কর্ত্তাকে পুত্রপৌত্রাদির হস্তে আপনার সংসারের ভার দিয়া বৃদ্ধ বয়সে তীর্থক্ষেত্রে ভগবচ্চিন্তা করিতে দেখি না? বৃদ্ধবয়সে আমরা নিজেরাই কি ইউরোপীয়দিগের ন্যায় শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কাজের জোয়াল ঘাড়ে করিয়া মরিব? আশ্রমধর্ম্ম জীবিত নাই তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস হিন্দু কখনই বিষয়কর্ম্মের জোয়াল কাঁধে করিয়া মরিবে না। যতদিন তাহা হয় ততদিন বলিব আশ্রমধর্ম্ম বাঁচিয়া আছে। তাহার পর পরিবারধর্ম্ম। আমাদের দেশে বৈষয়িক জীবনসংগ্রাম এখন খুব কঠোর হইয়া পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের ব্যক্তি পূজাও আমরা আমাদের সমাজে আনিতেছি; তবুও আমরা এখনও কি বাপ খুড়া জেঠার সহিত বাস করি না? আমরা এখনও বলিয়া থাকি

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

আমাদের গৃহ শুধু স্ত্রীপুত্র লইয়া নহে, আমাদের গৃহ মাতাপিতা আত্মীয় কুটুম্ব পোষ্য প্রতিবেশী লইয়া। এখনও আমরা ভারতাত্মার শিক্ষা ভুলিতে পারি নাই—

"গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে;
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে।
নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল।
সম্পদেরে পুণ্য কর্ম্মে করেছ মঙ্গল।
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে!"

তবুও আমাদের সেই প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রম পরিবার আর নাই। নাই বা থাকিল? আমরা যে ক্রমোন্নতিশীল হিন্দু। হিন্দুর ব্যক্তিত্ব কি ক্রমবিকশিত হইতেছে না? বর্ণ ও আশ্রম, জাতি ও পরিবার এতদিন হিন্দুর ব্যক্তিত্ব গঠন ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল। সমাজ যখন রাষ্ট্রের নিকট "সংরক্ষণ" আশা করিতে পারিল না, তখন হইতেই আমাদের সমাজবন্ধন শিথিল হইতে লাগিল, সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি হীনবল হইতে লাগিল। কিন্তু তখন হইতেই কি হিন্দুর ব্যক্তিত্বের অবনতি হইয়াছে? তাহা ত হয় নাই। হিন্দু পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত আচরণের সামঞ্জস্য করিবার একটা অসাধারণ ক্ষমতা (adaptability) দেখাইয়াছে, হিন্দুর ব্যক্তিত্ব বিকাশলাভ করিয়াছে। তাই বলিতেছি হিন্দু এখনও সজীব রহিয়াছে।

হিন্দু ও ইউরোপীয় ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশধারা

আমরা দেখাইয়াছি পাশ্চাত্যজগতে সমাজবন্ধন শিথিল হওয়াতে সেখানকার ভাবুকগণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজ দৃঢ় করিতেছেন। পূর্ব্বে সেখানে ধর্ম্ম সমাজগত ছিল, ধর্ম্মই সমাজবন্ধনের, ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খলতা

দমনের, উপায় ছিল। আমাদের দেশে ধর্ম্ম ব্যক্তিগত। আপনার মুক্তির উপায় আপনিই করিতে হইবে। ধর্ম্ম নহে, সমাজই ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করিত। ইউরোপে ব্যক্তি স্ব স্ব স্বাভাবিক অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সমাজের তাহার নিকট কোন দাবী নাই। সমাজই বরং তাহার নিকট ঋণী। ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লবের কারণ এই যে সমাজ রাষ্ট্রের নিকট আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারে নাই। তাই প্রজাশক্তি রাক্ষসীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সমাজকে একবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। হিন্দুসমাজে ব্যক্তি ঋণী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। "পঞ্চযজ্ঞ" করিয়া পঞ্চঋণ ব্যক্তিকে পরিশোধ করিতেই হইবে। হিন্দু স্বত্ব জানে না, "ঋণ" জানে; অধিকার জানে না, কর্ত্তব্য জানে। পাশ্চাত্য-সমাজ অধিকার জানে, কর্ত্তব্য জানে না; ব্যক্তির প্রভাব সেখানে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে ব্যক্তিত্ব বিকাশ পাইতেছে না। তাই পাশ্চাত্য-জগৎ হিন্দুসমাজের ক্রমবিকাশের মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতেছে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্যক্তির প্রভাব দমন করিতে চেষ্টা করিতেছে। পাশ্চাত্যসমাজ সজীব রহিয়াছে তাই সেখানকার ব্যক্তিত্ব নূতনভাবে বিকাশলাভ করিবার পন্থা খুঁজিতেছে।

হিন্দুও সজীব রহিয়াছে, তাই হিন্দুর ব্যক্তিত্ব নূতন ভাবে বিকাশলাভ করিতেছে। সমাজবন্ধন এখন শিথিল হইতেছে। হিন্দুর সনাতন সমাজতন্ত্র এবং বর্ণাশ্রম ও পরিবারধর্ম্মের মহিমা চলিয়া যাইতেছে। তাহার জন্য কাঁদিবার অবসর নাই। আধুনিক হিন্দুর ব্যক্তিত্ব বর্ণাশ্রম ও পরিবারধর্ম্মের মূলমন্ত্রগুলি হজম করিয়াছে। হিন্দুসমাজের সমস্ত অতীতের মন্ত্রগুলি আমাদের মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়াছে। অতীত আমাদের নিকট অচেতন নহে।

"তব সকার শুনেছি আমার
মর্ম্মের মাঝ খানে,

কত দিবসে কত সঞ্চয়
রেখে যাও মোর প্রাণে।
*   *   *
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।"

নর-নারায়ণপূজা ও প্রেমধর্ম্ম হিন্দুর নূতন ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক

অতীতের সমাজজীবনের সমস্ত ধারাগুলি সমাজের প্রাণে আসিয়া মিশিয়াছে। হিন্দুর প্রাণ, হিন্দুর ব্যক্তিত্ব অতীতের শক্তিতে শক্তিমান ত হইয়াছেই, ভবিষ্যতের জন্য উহা এখন কঠোর শক্তিসাধনায় নিযুক্ত। ভবিষ্যতের জন্য এই কঠোর শক্তিসাধনার ফল হিন্দুর ব্যক্তিত্বে নূতন গুণের সমাবেশ, হিন্দুর নারায়ণ পূজা।

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

এই আশা। হিন্দুর বৈরাগ্য এখন সমাজবিমুখ নহে, হিন্দুর মোহ এখন মুক্তি; প্রেম এখন ভক্তি হইয়াছে। সমাজবন্ধন এখন শিথিল হইয়াছে কিন্তু হিন্দুর নূতন ব্যক্তিত্ব সেবার ধর্ম্মে, প্রেমের ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনাকে প্রেমের বন্ধনে সমাজের নিকট ধরা দিয়াছে। আধুনিক হিন্দুর নরনারায়ণ পূজার মর্ম্ম সেই একই। হিন্দু এখন সমাজের সকলের মধ্যে প্রেমানুভূতি ও আত্মানুভব করিতেছে।

নরনারায়ণ পূজা হিন্দুর আধুনিক সমাজবন্ধনের সহায়

প্রাচীন হিন্দুর সমাজতন্ত্র এখন হীনবল, কিন্তু আধুনিক হিন্দুর নর-নারায়ণ পূজা সমাজবন্ধনকে দৃঢ় করিয়া দিয়াছে।

প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ছিল, এখন ধর্ম্ম সমাজগত হইয়াছে। ধর্ম্ম এখন সমাজমুখীন হইয়াছে। হিন্দু এখন গীতার এই শ্লোকে অনুপ্রাণিত—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।

আধুনিক হিন্দুর সেবার ধর্ম্ম কোমৎ হেগেলের মানবহিতবাদের (humanitarianismএর) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। হিন্দুসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যে প্রচার করিয়াছেন

"জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর,"

তাহার দ্বারাই আমরা অনুপ্রাণিত।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

ভগবান চৈতন্য যে ঈশ্বরে প্রেম ও জীবে দয়া করিতে বলিয়াছেন, তাহাতে এবার আমাদের দেশ পাগল হয় নাই। আমাদের সমাজ এবার পাগল হইয়াছে, অদ্বৈতনিষ্ঠ বিবেকানন্দের বাণীতে—জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন, নর ও নারায়ণ অভিন্ন, মানুষের সেবা করা ভগবানের সেবা করা, মানুষের সেবায় প্রেমানুভূতি ও আত্মানুভব করা। বিবেকানন্দের সেই বাণীতে,

"হে ভারত, ভুলিও না—তোমা নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য সর্ব্বত্যাগী উমানাথ শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়-সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"

এবং ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহার শরীরের শিরায় শিরায় এক বিশ্বব্যাপী প্রাণ-তরঙ্গমালা অনুভব করিয়াছেন, সেই অনন্ত প্রাণ, আমাদের সমাজকে আজ মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বপ্রাণের বিরাট স্পন্দন অনুভব করিয়াই আমরা জীবে দয়া ও ঈশ্বরের সেবায় অভিন্নতা

বুঝিয়াছি। আমাদের ঘরে ঘরে এখন নারায়ণ ভোগ ও পূজা পাইতে-ছেন। ঘরের বাহিরে রাস্তায় মাঠে হাটে ঘাটে নর-নারায়ণ আমাদের সেবা লইয়া ফিরিতেছেন।

হিন্দুর আশা

হিন্দুসমাজে নরনারায়ণ পূজা করিয়া হিন্দু আজ সমাজবন্ধনের শৈথিল্যের কুফল প্রতিরোধ করিয়াছে। হিন্দু সবল, স্বাধীন ও নির্ভয় হইতেছে, দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা ত্যাগ করিতেছে।

জীবের মধ্যে শিব রয়েছেন সকল কালে সকল কাজে,
শঙ্কা কি তোর? ঝাঁপ দিয়ে পড়, দেখরে তাঁরে নিজের মাঝে।

হিন্দু নিঃশঙ্কচিত্তে বিষম অগ্নিপরীক্ষায় ঝাঁপ দিয়াছে। বাস্তবিক বিংশ শতাব্দীতে নর-নারায়ণই ভবিষ্যৎ হিন্দু-চরিত্রের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ হইয়াছেন। বুদ্ধ অবতারে নর-নারায়ণ জগতে করুণা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে নারায়ণ জগতে সেই একই বাণী প্রচার করিয়া জগদ্ব্যাপী অশান্তি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে শান্তি ও আনন্দ আনিবেন। হিন্দুসমাজ তাঁহার পূজার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। তিনি আসিলে বিশ্ব-সভ্যতার মধ্যে যে তাহার জীবন সার্থক হয়; তাই সে অটল বিশ্বাসে ভবিষ্যতের জন্য উন্মুখ রহিয়াছে,—

"ভবিষ্যতের পানে মোরা চাহি আশা-ভরা আহ্লাদে।
বিধাতার কাজ সাধিব আমরা ধাতার আশীর্ব্বাদে॥"
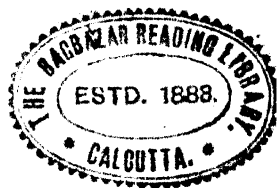
যুদ্ধ ও শান্তি

আধুনিক জগতে কুরুক্ষেত্র

যে মহাযুদ্ধ নিশ্চিত হইবে বলিয়া আমি অনুমান করিয়াছিলাম, তাহা আরম্ভ ও শেষও হইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধিয়াছিল। যে সকল জাতি জগতে তথাকথিত সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ সোপানে উঠিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ। সে সময়ে সভ্যজাতির পক্ষে যুদ্ধ করা ন্যায়সঙ্গত কি না, তাহা চিন্তা করিবার পর্য্যাপ্ত অবসর ছিল না। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এখন ন্যায়, অন্যায় বিচার লোপ পাইয়াছে। সুসভ্য ইউরোপ শক্তি সামর্থ্যকে ন্যায়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রাচ্য জগতে কুরুক্ষেত্রের পর নূতন ভাবে সাম্রাজ্য গঠন হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জগতেও তাহাই হইবে; ভাঙ্গাগড়া কাজ এখনও চলিতেছে।

ইউরোপের তথা-কথিত শান্তি

এখন লোকে বলিতেছে, ইউরোপের কুরুক্ষেত্র, ঘোর সর্ব্বনাশ। কিন্তু বাস্তবিক ইউরোপে বহুকাল অবধিই যুদ্ধ চলিতেছে। ইউরোপ সত্য সত্যই এতকাল শান্তির মধ্যে থাকে নাই। ইউরোপের শান্তি কি রকম,—না, কাল যুদ্ধ করিতে হইবে, যুদ্ধক্ষেত্রে রাত্রিকালে নিদ্রিত সৈনিকের শান্তির মত। নিদ্রিত সৈনিক যেমন স্বপ্নে যুদ্ধের বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠে,—সেরূপ, ইউরোপবাসীও অহরহ যুদ্ধের ভয়ে ত্রস্ত হইয়াছে,—তাহার নিজের সৈনিকের বেশ, তাহার সম্মুখে

পশ্চাতে দক্ষিণে বামে বারুদ ভরা কামান বন্দুক,—তাহার পক্ষে কি শান্তি সম্ভব—শান্তির মধ্যেও যে সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, শান্তির মধ্যে তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য যুদ্ধকে স্থগিত রাখা। যুদ্ধ আজ না হয়, কাল হইবেই। কল্যকার যুদ্ধের জন্য আপনাকে প্রস্তুত রাখিয়া যাহাতে আজ যুদ্ধ না হয় তাহার জন্য চেষ্টা বিধান করা ইউরোপীয় রাজনীতির প্রধানতম কর্ত্তব্য।

ইউরোপীয় সভ্যতায় ব্যক্তিগত ও জাতিগত আত্ম-প্রতিষ্ঠাবিধান

তাই আজ যুদ্ধ লাগিয়াছে বলিয়া গতকল্যের শান্তির কথা মনে করিয়া জার্ম্মাণীকে শান্তিভঙ্গের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা কর্ত্তব্য নহে। সমগ্র ইউরোপ এ যুদ্ধের জন্য দায়ী। যে ইউরোপীয় সভ্যতা শান্তির মধ্যেও যুদ্ধের বিপুল আয়োজন করিয়াছে, সেই সভ্যতা ইহার জন্য দায়ী।

বহু শতাব্দীর সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে ইউরোপে জাতিত্ব বিকাশের উপায় হইয়াছে, আত্ম-নিবেদন নহে, আত্ম-প্রতিষ্ঠা। ইউরোপীয় সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার দাবী পূরামাত্রায় আদায় করিয়া লয়, অন্যের প্রতি আপনার কর্ত্তব্যসাধনে তৎপর নহে। লোকে সেখানে আপনার দাবী খুব বুঝিয়াছে, আপনার কর্ত্তব্য ভাল করিয়া বুঝে নাই। সেখানে বিভিন্ন লোকের স্বত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী দাবী, সমাজের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিকূল স্বত্ব লইয়া অহরহ তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে, ঐ সকল আন্দোলনের ভিতর দিয়া পাশ্চাত্য সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর। বৈষয়িক-ক্ষেত্রে ধনী ও শ্রমজীবীদিগের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব, রাষ্ট্রীয় জগতে লোক সাধারণ ও ভূম্যধিকারীদিগের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব, সকলেরই মূলে সেই একই তত্ত্ব—পাশ্চাত্যজগতে আপনার দাবী, স্বত্বের উপর অধিক ঝোঁক

পড়াতে, কর্ত্তব্য পরার্থের দিকে নজর বেশী পড়ে না। তাই পাশ্চাত্য-সমাজের অভ্যন্তরে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে।

বাহিরের সেই একই তত্ত্বের প্রভাবের ফলে ইউরোপ সদাসর্ব্বদাই যুদ্ধের জন্য সজ্জিত। প্রত্যেক জাতি আপনার দাবী পূরামাত্রায় আদায় করিয়া লইতে চাহে,—অন্তর্জ্জাতীয় স্বত্ব সে বুঝে, অন্তর্জ্জাতীয় কর্ত্তব্য সে জানে না।

ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির ব্যবহারে, জাতির সহিত জাতির ব্যবহারে সেই স্বত্বের দিকে ঝোঁক, দাবী আদায় করিবার চেষ্টা,—আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য সব পণ করা,—সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যবোধ হ্রাস, আত্মনিবেদনের ভাবের লোপসাধন।

জার্ম্মাণীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা

ইউরোপীয় সভ্যতার মূল মন্ত্রগুলি বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া ইউরোপের ভিতরে যুদ্ধ বাহিরে যুদ্ধ। জার্ম্মাণী আগে তরবার হাতে করিল, তাহার জন্য সমগ্র ইউরোপ এখন তাহাকে গালাগালি দিতেছে। আখড়ায় সকলে সমবেত হইয়াছে, কুস্তি হইবে, একজন কুস্তিগির হঠাৎ সুযোগ পাইয়া আর একজনের ঘাড় মোচড়াইয়া ধরিল। জার্ম্মাণী ত ঠিক তাহাই করিয়াছে। জার্ম্মাণ-সম্রাট ত স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, অপরে আমাদের হাতে তরবার জোর করে গুঁজে দিয়েছে—আমাদের দোষ কি।

বাস্তবিক জার্ম্মাণ-জাতি আপনাকে দোষী মনে করিতেছে না। প্রিন্স বুলো ঘোষণা করিয়াছেন,—সমগ্র অন্ধকার জগতে যদি ভূতের নৃত্য হইয়া থাকে, তবুও আমরা সূর্য্যালোকের মধ্যে বাস করিব। জগতে প্রত্যেক জাতি আপনার দাবী পূরামাত্রায় আদায় করিয়া লইয়াছে বা লইতেছে। ইংলণ্ড জগৎ-জোড়া সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে ও ভোগ

করিতেছে। ইংলণ্ডের বাণিজ্যের গতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র। জার্ম্মাণী বাণিজ্যে বিপুল উন্নতি লাভ করিয়াছে। জগতের সর্ব্বত্রই জার্ম্মাণীর বাণিজ্য প্রাধান্য লাভ করিতেছে। একটা যদি চলনসই রকমের সাম্রাজ্য থাকিত তাহা হইলে বাণিজ্য প্রসারের কি সুবিধা হইত! জার্ম্মাণী ইংলণ্ডের অনেক বৎসর পরে সামুদ্রিক বাণিজ্যের উন্নতিসাধন ও সাম্রাজ্য-স্থাপন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে,—তাই তাহার ভাগ্যে কিছুই সুবিধা হয় নাই। সীলার দুঃখ করিয়াছিলেন, অন্যজাতি পৃথিবীকে পূর্ব্বেই ভাগ বাটওয়ারা করিয়া লইয়াছে, জার্ম্মাণীর পক্ষে কিছুই লইবার নাই, এক আকাশ শুধু রহিয়াছে। (The world had been given away to foreign nations, and there is nothing left for Germany to appropriate except the sky.) সীলারের পর নূতন নূতন দেশ আবিষ্কৃত হইয়াছে, জার্ম্মাণী নবাবিষ্কৃত পৃথিবীতে আপনার স্বত্ব স্থাপন করিয়াছে। সীলারের "পৃথিবী" সম্বন্ধে ধারণা ঠিক হয় নাই; কিন্তু এক পক্ষে তাঁহার কথা ভবিষ্যদ্বাণী হইয়াছে। জার্ম্মাণী আকাশ-তরী নির্ম্মাণ করিয়া আকাশে সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে,—সীলারের অলীক কল্পনা বাস্তবজগতের সত্যে পরিণত হইয়াছে। বৃহত্তর জার্ম্মাণী এক্ষণে কাই-চৌ হইতে টোগল্যাণ্ড, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা হইতে কামেরুণ পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,—লোক সংখ্যা এক্ষণে ১৫,০০০,০০০। তাহাদের মধ্যে শ্বেতকায়দিগের সংখ্যা ২৪,০০০। বৃহত্তর জার্ম্মাণীর বাজেট—৯,০০০,০০০ পাউণ্ড। তাহার অর্দ্ধেক জার্ম্মাণীকে দিতে হয়। আমদানী রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য ১০,০০০,০০০ পাউণ্ড। বাস্তবিক জার্ম্মাণীও একটা ছোটখাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে।

অনেকের ধারণা, জার্ম্মাণীর লোক সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে দেশে থাকিয়া সকলের জীবিকানির্ব্বাহের সুবিধা হইতেছে না, তাই জার্ম্মাণীর সাম্রাজ্যস্থাপন একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। ইংলণ্ডের কোন

এক রাজসচিব জার্ম্মাণীর সাম্রাজ্যস্থাপনটাকে বিলাস উপভোগের ব্যাপার বলিয়াছিলেন বলিয়া জার্ম্মাণীর কাগজমহলে তুমুল প্রতিবাদধ্বনি শুনা গিয়াছিল। জার্ম্মাণী আপনার সাম্রাজ্য তাহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক মনে করে,—কিন্তু আবশ্যক মনে করে অন্য কারণে—অতিরিক্ত লোক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নহে, ব্যবসায় উন্নতির জন্য। জার্ম্মাণীতে লোক সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পায় নাই যে তাহার জন্য তাহাকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। পাশ্চাত্য ইউরোপের সকল দেশের মত জার্ম্মাণীতে লোক-বৃদ্ধির হার কমিতেছে,—জার্ম্মাণীতে প্রতিবর্গ মাইলে লোকসংখ্যার গুরুত্ব গড়ে ইংলণ্ডের অর্দ্ধেক। জার্ম্মাণীতে এখনও কার্য্যাভাব দেখা যায় নাই,—সেখানে সৈন্যবিভাগে ৩৩,০০০, সিভিল বিভাগে ৫৫,০০০ চাকুরী খুলা রহিয়াছে, তাহা ছাড়া লিষ্টের উপদেশানুসারে ও বিস্মার্কের প্রেরণায় জার্ম্মাণী শিল্পব্যবসায় ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়া শিল্পবাণিজ্য জগতে এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে যে যে কোন শিক্ষিত জার্ম্মাণকে কার্য্যাভাবে অন্য দেশে যাইয়া জীবিকার্জ্জনের প্রয়োজন হয় নাই। জার্ম্মাণীতেই বরং প্রতিবেশী দেশের লোকেরা বৎসর বৎসর আসিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছে ও তাহার লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে।

জার্ম্মাণীতে একটা মত ছিল, লোক সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে জার্ম্মাণীর পক্ষে ইংলণ্ডের মত জার্ম্মাণের বসবাসের জন্য নাতিশীতোষ্ণ-প্রদেশে রাজ্যস্থাপন একান্ত আবশ্যক। হার ডার্ণবার্গ, যাহাকে জার্ম্মাণ চেম্বারলেন বলা হয়, এই মতেরই পক্ষপাতী ছিলেন। জার্ম্মাণ জাতি এ মত এখন পোষণ করে না,—সে সাম্রাজ্যকে তাহার শিল্পবাণিজ্যের অবলম্বন মনে করে, সাম্রাজ্য হইতে তাহার খাদ্য আসিবে, তাহার শিল্প ব্যবসায়ের উপকরণ দ্রব্য আসিবে, এই মনে করিয়া সে সাম্রাজ্যকে তাহার একান্ত আবশ্যক মনে করিয়াছে। আগাডির গোলমালের পর যখন জার্ম্মাণী ফরাসী কঙ্গোর একটুকরা জমি লইয়া সন্তুষ্ট হইল, তখন

হায় ডার্নবার্গ তাঁহার মত বজায় রহিল না দেখিয়া পদত্যাগ করিলেন। ডার্নবার্গের পদত্যাগের পর পূর্ব্ব মত আর দাঁড়ায় নাই। মিউনিচের ধনবিজ্ঞানবিশারদ অধ্যাপক বন বলেন, তাঁহার পদত্যাগে দুইটা বিপরীত আদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মীমাংসা হয়—(a dramatic end of the fight between two schools of colonial ideals)। এক্ষণে জার্ম্মাণ-জাতি নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশের জন্য বিশেষ ব্যগ্র নহে। সাম্রাজ্য জার্ম্মাণের বসবাসের জন্য প্রয়োজন হইবে না, সাম্রাজ্যের প্রয়োজন জার্ম্মাণীর শিল্প-ব্যবসায়ের উপকরণ দ্রব্যসামগ্রীর নিশ্চিত জোগাড়ের জন্য এই ভাবিয়া উষ্ণপ্রদেশেও রাজ্যস্থাপন করিয়া বহু অর্থ ব্যয়ে জার্ম্মাণী এক্ষণে শিল্পাদির উপকরণ জোগাড় করিতেছে।

সাম্রাজ্যস্থাপনের দ্বারা শিল্পব্যবসায়ের উন্নতি সামুদ্রিক শক্তির উপর নির্ভর করে। তাই জার্ম্মাণী সামুদ্রিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য দরিদ্রদের নির্য্যাতন করিয়া, করস্থাপন করিয়া রণ-তরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। সামুদ্রিক শক্তিতে ইংলণ্ডের সমকক্ষ হওয়া তাহার একান্ত ইচ্ছা। এত চেষ্টা করিয়াও সে কিছুতেই কিছু করিতে পারে নাই। বেলজিয়ামে প্রভুত্ব স্থাপন করিলে তাহার সামুদ্রিক শক্তি যে খুব বৃদ্ধি পাইবে এবং ইংলণ্ডের সমকক্ষ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে, ইহা নিশ্চিত। তাই আগেই সে বেলজিয়াম আক্রমণ করিয়াছে।

ফ্রান্সের শত্রুতা

জার্ম্মাণীর শক্তি বৃদ্ধির অন্তরায়, ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ফ্রান্সের শত্রুতা। ইংলণ্ড কিছুতেই জার্ম্মাণীকে বেলজিয়াম ও হলাণ্ডে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে দিবে না, তাহার জন্য সে সমস্ত পণ করিবে। ফ্রান্স জার্ম্মাণীর চির শত্রু। এককালে নেপোলিয়ন ইউরোপের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ছিলেন, তাঁহার সময়ে ফরাসী জাতির নিকট জার্ম্মাণী পদানত, সেই

জার্ম্মাণী ফ্রান্সের নিকট হইতে জোর করিয়া আলসস ও লরাইন কাড়িয়া লইয়াছে, তৃতীয় নেপোলিয়নকে ছলে কৌশলে বন্দী করিয়াছে, ফ্রান্স জার্ম্মাণীকে তাহার পরাজয়ের নিদর্শন স্বরূপ বৎসর বৎসর অনেক অর্থ দিয়াছে, ফ্রান্স সে অপমান ভুলে নাই, ফ্রান্স প্রতিশোধ দিবার জন্য ব্যগ্র, তাই জার্ম্মাণী এখন ভাবিয়াছে, ফ্রান্সকে আক্রমণ করা, তাহাকে একেবারে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, তাহার আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়।

খৃষ্টীয় নীতি-বর্জ্জন

খৃষ্টের সার্মন পাদ্রীদের জন্য, মানুষের জন্য জাতির জন্য অন্য সার্মন। এই নূতন সার্মন ইউরোপে প্রচার করিয়াছেন, প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ দার্শনিক নাইট জে। সে সার্মন অনুসারে শান্তি একটা মোহ, যুদ্ধ একটা আনন্দ, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি সে সার্মন অনুসারে মানুষকে জড়তায় অকর্ম্মণ্য অপদার্থ করিয়া ফেলে,—যুদ্ধ আত্মাকে সজাগ রাখে, ভাবুকতাকে সজীবতা দেয়। যুদ্ধ না থাকিলে জগৎ বাস্তবতার পঙ্কিল স্রোতে পচিয়া গলিয়া ধসিয়া ডুবিবে। যুদ্ধই ভাবুকতার প্রস্রবণ—মনুষ্যের অন্তরে প্রচণ্ড শক্তি যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কিছু জাগাইতে পারে না, হিংসা বৈরী শত্রুতা হইতেই চরম ব্যক্তিত্বের সূচনা, শত্রুকে হত্যা নিপীড়ন হইতে বিশুদ্ধ বিবেকের উৎপত্তি, আপনার জীবনকে তুচ্ছ করিয়া বিপক্ষের বক্ষে অশনির মত ঝাঁপাইয়া পড়া দর্প বা অহঙ্কার নহে, পাশবিক বৃত্তিনিচয়ের অনুশীলন নহে,—মনুষ্যত্বের উচ্চতম সোপানে উঠা—নাইট জে এই সব কথাই বলিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ইউরোপ তাই খৃষ্টের নীতিকে পদদলিত করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর। দীনবন্ধু আতুরসহায় খৃষ্ট আজ ইউরোপের হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত নহে, খৃষ্টের পরিবর্ত্তে নাইটজের Superman—অতিমানুষ, আজ দুর্ব্বলকে পদদলিত নিস্পেষিত করিয়া হত্যা করিয়া তরবারী হাতে লইয়া ইউরোপের রক্তবিলেপিত পূজাপুষ্প গ্রহণ করিতেছে। সেই অতিমানুষ যেন

ছিন্নমস্তা—তাহার পার্শ্বে ধ্বংস ও স্বার্থসিদ্ধি দুই ডাকিনীযোগিনী, তাহার পদতলে চিরন্তন মনুষ্যত্ব নিষ্পেষিত হইতেছে, এবং সে আপন রুধির ধারায় আপনাকে ও তাহার পার্শ্বচারিণীদ্বয়কে মাতাল করিয়া তুলিয়াছে।

যুদ্ধ ও সভ্যতা

এত বড় যুদ্ধ জগতে এই প্রথম। নেপোলিয়নের সময়ে খুব জোর এক লক্ষ লোক যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। রুশ-জাপানী যুদ্ধে এক একটা যুদ্ধে দশ লক্ষ লোক মিলিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। এবার কোটি লোকের যুদ্ধ হইয়াছে। এতগুলি দেশ মিলিয়া এবং এত বড় বড় দেশের মধ্যেও জগতের ইতিহাসে কখনও যুদ্ধ হয় নাই। একটা প্রকাণ্ড মহাদেশ জুড়িয়াও যুদ্ধ হয় নাই। এরূপ রক্তপাত, শিল্পবাণিজ্যের পতন, সাহিত্যে চিন্তায় ভাবুকতার প্রতিরোধ, এত লোকের এত কষ্ট পৃথিবীর ইতিহাসে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আসকুয়িথ এ যুদ্ধ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—a contest which for the number and importance of the powers engaged, the scale of their armaments and armies, the width of the theatre of conflict, the outpouring of blood and loss of life, the incalculable toll of suffering levied upon non-combatants, the material and moral losses accumulating day by day, —but in the highest interests of civilisation—a contest which in every one of these aspects was without precedent in the annals of the world. এত দুঃসহ বেদনা অনুভব করিয়া নূতন সভ্যতা জন্মগ্রহণ করিবে, ইহা অনেকের আশা।

আধুনিক ইউরোপে শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ

আসকুয়িথ বলিয়াছেন, যুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত সভ্যতার উন্নতিই হইবে। সভ্যতার দিক হইতে একটা কথা অন্ততঃ বলিতে পারা যায়। আধুনিক

জগতে যুদ্ধ ও শান্তি স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল হইয়াছিল যে ইদানীং অনেকে সত্য সত্যই অনুমান করিতেছিলেন যে যুদ্ধ ভবিষ্যতে অসম্ভব। কত দিক হইতে জগতে শান্তি স্থাপনের উদ্যোগের পুষ্টিবিধান হইতেছিল তাহা বলা কঠিন। সমাজতন্ত্রবাদীদের আশা, শ্রমজীবিগণ সমাজে আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিলে যুদ্ধ অসম্ভব। নব্য আর্ট আন্দোলনের নেতারা ভাবিতেছিলেন, অতীন্দ্রিয় আর্ট জগতে শান্তি আনিবে। ব্যবসায়িগণ ভাবিতেছিলেন, অন্তর্জ্জাতীয় বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কিং নীতি জগতে বিভিন্ন জাতিকে এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ রাখিয়াছে যে সে সম্বন্ধ কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যায় না। সকলেই বলিতেছিলেন, zeit-geist পৃথিবীতে শান্তিস্থাপন করিবে। এমন সময়ে যুদ্ধ বাধিল। ষ্টেড, নরমান অ্যানজেলস, হেগ কনফারেন্সের বিধি নিষেধ কেহ মানিল না। অনেক বার যুদ্ধ হইতে হইতে হয় নাই। কিন্তু এবার সত্য সত্যই পালে বাঘ আসিয়া পড়িল।

যুদ্ধাবসানে শান্তির জন্য ব্যাকুলতা

শান্তিভঙ্গ তখনই হইল, যখন ইউরোপ শান্তির জন্য ব্যাকুল। এই যুদ্ধের পর যুদ্ধের অনিষ্ট রক্তপাত অত্যাচারনির্য্যাতনের পর ইউরোপ যুদ্ধকে আর বরণ করিতে চাহিবে না, যুদ্ধকে মৃত্যুর মত, মারীভয়ের মত, বিভীষিকার মত প্রত্যাখ্যান করিবে। যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন উপায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব নিবারণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবে।

নবজাগ্রত এসিয়ার আশা ইউরোপকে শান্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করিবে।

অতীত ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনা—
সাম্রাজ্য স্থাপনে মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা

যুদ্ধাবসানে ইউরোপের নিকট ভারতবর্ষের বাণী-প্রচার অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে। ভারতবর্ষের সাধনা কি? রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে হিন্দু ভারতবর্ষের

সাধনা বিশ্বজগতের চিন্তাক্ষেত্রে একটা যুগান্তর আনিবে। যদি সে সাধনা আবার পুনর্জ্জীবিত হয়, যদি সে সাধনার ভিতর আবার প্রাণ আসে, ভাবুকতা আসে, বিশ্বাস আসে। ভারতবর্ষ একটা সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল,—বিপুল রোমীয় সাম্রাজ্যের মত সে সাম্রাজ্যের অবলম্বন বাহুবল ছিল না, সীজার, শার্লিমান, নেপোলিয়ানের মত সেনা-নায়ক সে সে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে নাই। সে সাম্রাজ্যের অবলম্বন ছিল,—অহিংসা, মৈত্রী,—শুধু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে সখ্য নহে ভগবানের প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের মধ্যে সখ্য। সে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সেনানায়কের আবশ্যক হয় নাই, আবশ্যক হইয়াছিল—সীজারের নহে, অশোকের ; প্রোকনসালের নহে, শ্রমণের ; সেনাবলের নহে, ভিক্ষুদলের সে সুন্দর সাম্রাজ্য কালের অত্যাচারে ধূলায় মিশিয়াছে,—ধূলিকণা হইতেও হায় সে সাম্রাজের অতীত গৌরবকাহিনী লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

সাম্রাজ্য-স্থাপনে রোমীয় আদর্শের নিষ্ফলতা

বিশ্বজগৎ যে সাম্রাজ্যের কথা ভুলিয়াছে। বিশ্ববাসী রোমীয় সাম্রাজ্যের মহিমাতেই মুগ্ধ, অন্য প্রকার সাম্রাজ্যের খবর সে রাখে না। যুগে যুগে ইউরোপ রোমীয় সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার কত না বিপুল আয়োজন চলিয়াছে। আজ বিংশ শতাব্দীতে আবার সে আয়োজন দেখা গেল। জার্ম্মাণ জাতি চিরকালই সাম্রাজ্য স্থাপনের পক্ষপাতী, সে Kaiseredom র ভক্ত। কাণ্ট বিশ্বে শান্তি রাজ্য স্থাপনের আশা করিয়া একটা অন্তর্জাতীয় সন্ধিপত্রের খসড়া করিয়াছিলেন। হেগেল বিশ্বসাম্রাজ্যকে বিভিন্ন জাতি ও বিশ্বমানবের পক্ষে একান্ত শ্রেয়স্কর অনুষ্ঠান ভাবিয়াছিলেন। জার্ম্মাণীর আধুনিক পণ্ডিতগণও বিশ্বসাম্রাজ্য weltrecht স্থাপনের আশা ছাড়েন নাই। ব্রুনশ্লি ভাবিয়াছেন অন্তর্জাতীয় স্বত্ব বিশ্বসাম্রাজ্য স্থাপন ভিন্ন টিকিতে পারে না। আজ সেনাবলের দ্বারা অন্তর্জাতীয় স্বত্বকে পদদলিত

করিয়া সে সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্যোগ হইল; সীজার, শার্লিমান, নেপোলিয়নের দুরন্ত আশা, প্রচণ্ড বাহুবল পুনর্জ্জীবিত হইল; রোমীয় সাম্রাজ্যের পুনরাবির্ভাবের আয়োজন হইল।

হিন্দু আদর্শের অন্তর্জাতীয় মৈত্রীর সাধনা

কামান বন্দুকের শব্দ, তরবারির ঝনঝনানি, রক্তস্রোতের কলকল ধ্বনি যখন থামিবে, যখন হিংসা দ্বেষ দর্প অহঙ্কারের একান্ত বিনাশ সাধন হইবে,—তখন হয়ত বিশ্বজগৎ বুঝিবে বাহুবলের দ্বারা কখনই বিশ্বসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। অন্তর্জাতীয় সখ্য স্থাপনের দ্বারা সে সাম্রাজ্য স্থাপন একমাত্র সম্ভব। হিন্দু ভারতবর্ষের লুপ্ত সাধনা তখন প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিকে তাহার হিংসা দ্বেষ ভুলিতে বলিবে, তাহাদের সেনাবল বৃদ্ধি নিষেধ করিয়া সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি করিতে বলিবে। রোমীয় সাম্রাজ্যের বৈরীর সাধনা পুনর্জ্জীবিত হইয়া ইউরোপের ইতিহাসে বহুবার অশান্তি মহানিষ্ট আনিয়া দিয়াছে। হিন্দু ভারত সাম্রাজ্যের মৈত্রীর সাধনা ইউরোপীয় জগতে প্রচারিত হইবার সুযোগ লাভ করে নাই, পাশ্চাত্য জগতের এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যেই রোমীয় ভাবের মোহ দূর হইবে। বিশ্বমানবের নব মৈত্রী-গীতার প্রচার হইবে। পাশ্চাত্য জগৎ ভারতীয় সাধনার মহিমা তখন বুঝিবে, মৈত্রী, প্রেম সাধনার দ্বারা বিশ্বজগৎ তখন শান্তিরাজ্য গঠন করিবে, জাতির সহিত জাতির ব্যবহারে হিংসা নীতি বিসর্জ্জিত হইবে,—বিশ্বজগৎ এক বিরাট প্রেমরাজ্যের অভ্যুত্থান দেখিবে, সে বিরাট রাজ্যের অবলম্বন হইবে,—নেপোলিয়ান, শার্লিমান, সীজার, আলেকজাণ্ডারেরও সাধনা নহে,—জগতে প্রথম প্রেম সাম্রাজ্যের অধিনায়ক ধর্ম্মনীতির প্রচারক ভিক্ষু সম্রাট দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোকের সাধনা। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় জগতের সাধনা তখন সিদ্ধিলাভ করিবে, শুধু ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম সাধনা নহে।

আমাদের বিশ্বাস, ইউরোপের এই সমরযজ্ঞানল হইতে স্বয়ং লোক-পিতামহ উত্থিত হইয়া মৈত্রী ও অহিংসা দুই রাম লক্ষ্মণের জন্মদানের জন্য বিশ্বজগৎকে ভাব-চরু অর্পণ করিবেন।
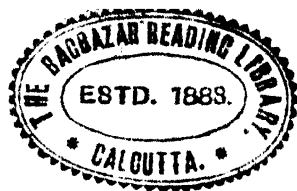
যুযুৎসু-বিজ্ঞান

জীবন-সংগ্রাম

সংগ্রামের মধ্য দিয়াই জীব ক্রমোন্নতি লাভ করে—এই মত আধুনিক বিজ্ঞান প্রচার করিয়াছে। প্রত্যেক জীবই জগতে এত অধিক সন্তান উৎপাদন করে যে প্রত্যেকের আহারসংস্থান অসম্ভব। কাজেই সংগ্রাম, যোগ্যতমের জয় ও জীবের উন্নতি। সব সময়েই যে সত্যসত্যই জীব-জাতির মধ্যে যুদ্ধ, খুনাখুনি মারামারি হইয়াছে তাহা নহে; কিন্তু "জীবন-সংগ্রাম" হইয়াছে তাহার ফলে যোগ্যতমেরা প্রতিযোগিতায় অধিকতম সুবিধা লাভ করিয়া টিকিয়া গিয়াছে, অযোগ্যেরা উন্নতি লাভ করে নাই অথবা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। জীববিজ্ঞানের এই মূল তত্ত্ব খুব ব্যাপক। শুধু নিম্নস্তরের জীব-জগতে নহে, মনুষ্য-সমাজে, বিভিন্ন জাতির প্রতি-দ্বন্দ্বিতায়, ইহা সমানভাবে প্রযুক্ত।

জীব-বিজ্ঞানের এই তত্ত্বই বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর সমর-তত্ত্ব। ভন বার্ণাডী বলিয়াছেন, যুদ্ধ ন্যায়-সঙ্গত, যুদ্ধের বিধান ন্যায়ের বিধান "War gives a biologically just decision, since its decisions rest on the very nature of things."

জীবন-সংগ্রাম ও পরস্পর সাহায্য

যুদ্ধ প্রকৃতির বিধান, জীবের উন্নতিবিধানের জন্য প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম, সুতরাং যুদ্ধ ন্যায়ানুমোদিত, এই মত সঙ্গত কিনা তাহা বিচারযোগ্য। মানুষ ও অন্যান্য জীবের প্রভেদ বুঝাইতে হইবে না। মনুষ্য-জগতে

আমরা জ্ঞান, বুদ্ধি, নীতির রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হই, সেখানে জীব-জগতের অন্ধ প্রবৃত্তির হাতড়ান নহে, জ্ঞানের ধ্রুব আলোকে স্পষ্ট গতি। তাই মনুষ্য-জগতে নিম্নস্তরের প্রকৃতির বিধান খাটে না। মনুষ্য প্রকৃতির বিধানকে আপনার অন্তর্জ্জগতের ন্যায়ের বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তাই প্রকৃতির বিধানকে মনুষ্য-জগতে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া তুলা ন্যায়সঙ্গত হইবে না। ডারুইন নিজে বলিয়াছেন, জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম যে জাতির উন্নতির একমাত্র উপায় তাহা নহে, "I use the term struggle for existence in a large and metaphorical sense, including the dependence of one being on another." এক জীবের অন্যের উপর নির্ভরতা ইহাও জীবনযাত্রার প্রণালী এবং ইহা জীবন-সংগ্রাম-তত্ত্বের বিরোধী নহে। বাস্তবিক ডারুইন-তত্ত্ব যে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ সমর্থন করিয়াছে তাহা নহে; বরং উচ্চ জাতি-বিকাশের পক্ষে যুদ্ধ অন্তরায় তাহাই ডারুইন-তত্ত্বে প্রকাশিত।

সাম্রাজ্য-নীতি

অন্তর্জ্জাতীয় ক্ষেত্রে মানুষ যে প্রকৃতির সেই অলঙ্ঘনীয় নিয়মের দাস তাহা নহে। সক্ষমের জয় ও দুর্ব্বলের বিনাশ, এই নিয়মকে মানুষ অন্তর-রাজ্যের নিয়মের দ্বারা হটাইয়াছে। মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও আত্মার আদেশ ও নির্দ্দেশের দ্বারা, প্রকৃতির এক নিষ্ঠুর অলঙ্ঘনীয় বিধানের দ্বারা নহে, মনুষ্য-সমাজের গতি ও উন্নতি পরিচালিত।

এই কারণে দুর্ব্বল জাতির উপর এক সক্ষম জাতির অত্যাচার মনুষ্য-সমাজ কখনই ন্যায়ানুমোদিত ভাবিবে না।

দুর্ব্বল জাতির উপর সক্ষম জাতির অত্যাচার নানা আকার গ্রহণ করে। যুদ্ধের ব্যাপার আলোচনা করিয়া তাহা দেখাইতেছি।

যুদ্ধ করিয়া নূতন রাজ্য লাভ করা, নূতন রাজ্য জয় ও নূতন ভূমি ভোগ

করা, ইংরাজীতে যাহাকে বলে Earth-hunger, ভূমি-লোলুপতা, সক্ষম জাতি মাত্রেরই পক্ষে দেখা গিয়াছে। কোন কালেই ইহা ন্যায়ানুমোদিত নহে।

গত যুদ্ধে জার্ম্মাণীর ভূমি-লোলুপতা তাই জগতের বিচারে দণ্ডনীয়। উপনিবেশ-স্পৃহা এই ভূমি-লোলুপতার একটি আকার মাত্র। একটা জাতি জগতের বিভিন্ন দেশ ও সমাজের ভিতর দিয়া আপনার সত্তা অনুভব করিয়া, এক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানকে আশ্রয় করিয়া এক নূতন শক্তির আস্বাদ করিতে পারে। ইহাকে ভাবুকতা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বর্ত্তমান ইংলণ্ডের যদি কিছু ভাবুকতা থাকে তাহা ইহাই, ভবিষ্যতের রাষ্ট্র-মণ্ডলে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম এই উপনিবেশ-ব্যাপার লইয়া বিকাশ লাভ করিবে। The Expansion of England, ইংলণ্ডের বিস্তার, বৃহত্তর ইংলণ্ডের মত জার্ম্মাণীরও উচ্চাকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, বৃহত্তর জার্ম্মাণী জার্ম্মাণ-বাসীর নিকট একটা অলীক স্বপ্ন নহে। অনেকের আশা ইংলণ্ড বৃহত্তর জার্ম্মাণীগঠনের বিরোধী হইবে না। কিন্তু হয় কি অনেক সময় উপনিবেশ-স্পৃহা রাষ্ট্রীয় ভাবুকতা হইতে জন্মগ্রহণ করিলেও যখন জাতি শক্তির আস্বাদ একবার পায় তখন সে আর ভাবুকতার ধার ধারে না। ভাবুকতার নাম লইয়া ন্যায় অন্যায় ভুলিয়া যায়। জার্ম্মাণীতে উপনিবেশ-স্পৃহার ভাবুকতা অপেক্ষা শক্তিমত্তাই অধিক প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যখন ট্রিট্‌স্‌কে বলিলেন, আমাদের এইবার উপনিবেশ স্থাপনের পালা আরম্ভ, The result of our next successful war must, if possible, be the acquisition of some colony, তখন রাষ্ট্রীয় ভাবুকতা অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় শক্তির মোহ তাঁহাকে এবং তাঁহার সহিত সমগ্র জার্ম্মাণ জাতিকে পাইয়া বসিয়াছিল। শুধু যে জার্ম্মাণী-শক্তির মোহে অজ্ঞান তাহা নহে। এই ত সেদিন ইংরাজ জাতি সম্বন্ধে গ্লাড্‌ষ্টোনকে দুঃখ করিয়া বলিতে হইয়াছিল, The people of these islands are mad

and drunk with aggression. বোয়ার যুদ্ধ কাহার স্মরণ নাই, আমরা যাহা করিব তাহাই ঠিক, আমরা যাহা ভাবিব তাহাই ন্যায়, এমন একটা ভাব কি ইংরাজ-জাতিকে তখন পাইয়া বসে নাই ?

ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের অধিকার

উপনিবেশ-স্পৃহা, ভূমি-লোলুপতা, সাম্রাজ্য-স্থাপন, রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা সক্ষম জাতির পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও ন্যায়ানুমোদিত নহে। বড় রাজ্যের সহিত ছোট রাজ্যও থাকিবে। ছোট রাজ্য যে বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে তাহা নহে। The right of small states ছোট রাজ্যেরও অধিকার আছে। ছোট জাতিরও বিশেষত্ব আছে, তাহার বিলোপ-সাধন-চেষ্টা অন্যায় কার্য্য। তাই বেলজিয়ামের বর্ত্তমান অবস্থায় সমগ্র জগৎ সহানুভূতি ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। বেলজিয়ান জাতির বিশেষত্ব-বিলোপের চেষ্টা করিয়া জার্ম্মাণী জগতের ন্যায়-বিচারে দণ্ডনীয় হইয়াছে।

শুধু বেলজিয়ামের নহে সার্ভিয়ারাষ্ট্রের দশায়ও জগদ্বাসী সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছে। দুইটি ছোট রাজ্য একটা প্রবল পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যের নিকট দাসখত লিখিয়া দেওয়া অপেক্ষা মরণই আকাঙ্ক্ষা করিল। বিশ্বসভ্যতার ইসিহাসে এরূপ নিদারুণ ঘটনা বিরল নহে। যখন সমস্ত শৌর্য্য বীর্য্য ব্যর্থ, সৈন্যসংক্রান্ত নির্ম্মূল, যখন শস্যশ্যামল দেশ শ্মশান, স্তন্য-পীযূষ-বাহিনী নদী শোণিতবাহিনী, যখন দেশের বর্ত্তমান ঘোর লজ্জা ও হীনতায় অন্ধকারময়, তখন বর্ত্তমান অতীতের স্মৃতিকে বক্ষে করিয়া সান্ত্বনা লাভ করে, অতীতই তখন তাহার বর্ত্তমান দৈন্যের মধ্যে একমাত্র আশ্রয়।

"গেছে যদি সব সুখ কলরব অতীতের বাণী বাঁচিয়া থাক্।
চারণের মুখে সান্ত্বনা সুখে শূন্য মেবারে ধ্বনিয়া যাক্॥"

সেই অতীতের বাণী হইতেই সে তখন ভবিষ্যৎ গঠন করিতে থাকে। বিশ্বসভ্যতায় ইতিহাসে বিধ্বস্ত মেবার অনেক আছে। সাম্রাজ্যের

লোলুপতা, মোহ ও দম্ভ যতদিন আছে ততদিনই ছোট রাষ্ট্রের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

নীতির যুদ্ধ নহে, স্বার্থের যুদ্ধ

লোভ জিনিষটা কি ব্যক্তি, কি সমাজ, কি রাষ্ট্র—সকলেরই হিতাহিত-জ্ঞান নষ্ট করে। বেলজিয়াম ত বিধ্বস্ত হইয়া গেল। কিন্তু যতদিন বেলজিয়ামবাসী বাঁচিয়া আছে, ততদিনই বেলজিয়ামের অতীত বেলজিয়ান সভ্যতাকে বাঁচাইয়া রাখিবে। বেলজিয়াম-সমাজের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার লুপ্ত হইবে না। বেলজিয়াম-ভাষা ও সাহিত্যের তত ক্ষতি হইবে না। বেলজিয়াম-ব্যবসা-বাণিজ্যেরও বিশেষ ক্ষতি হইবে না। এমন কি, জার্ম্মাণী লাভ করিল যাহার জন্য এত অর্থব্যয়, এত রক্তপাত, এত হিংসা মারামারি কাটাকাটি! জার্ম্মাণী আপনার সভ্যতা আপনার সামাজিক অনুষ্ঠান, জোর করিয়া বিধ্বস্ত বেলজিয়ামকে হজম করাইতে পারিল না। বেলজিয়াম আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। অনেকে মনে করিয়াছিলেন গত, যুদ্ধ প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করিবার যুদ্ধ। জার্ম্মাণ-রাষ্ট্র ইউরোপীয় প্রজাতন্ত্রকে গ্রাস করিতে উদ্যত, সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করিবে। রুশিয়ার সম্রাট্ তাহা বোধ হয় ভাবেন নাই, যদি তিনিও তাহা ভাবিয়া থাকেন তবে সম্মিলিত রাষ্ট্র সমুদয়ের ভবিষ্যতের পক্ষে তাহা অমঙ্গল, সন্দেহ নাই। যাহাই হউক না কেন, সম্মিলিত শক্তি জয়ী হইলেও জার্ম্মাণীর উপর জোর করিয়া প্রজাতন্ত্র বসাইতে পারে নাই। স্বেচ্ছায় নূতন প্রজাতন্ত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি জার্ম্মাণীকে প্রজাতন্ত্র অবলম্বন করিতে হইত, তবে তাহাই প্রজাতন্ত্রের নীতিবিরুদ্ধ হইত। জার্ম্মাণী যে বলিয়াছে, আমরা জয়ী হইয়া অর্থলোলুপ জাতির অর্থাকাঙ্ক্ষা দূর করিব, তাহাতেও ভুল। চোরকে মারিলে ত সে সাধু হয় না। সুতরাং ইউরোপ যে বলিয়াছে ইহা একটা War of principles, বিরুদ্ধ-নীতির সঙ্ঘর্ষ লইয়া বর্ত্তমান যুদ্ধ, তাহার গোড়ায় গলদ। পরস্পর বিরুদ্ধ-নীতি এক সঙ্গে সাজাইলে বেশ

শুনায়, জাতি-প্রেম জাগিয়া উঠে,—কিন্তু উহার অন্তরে রহিয়াছে, হিংসা, জিঘাংসা। জোর করিয়া কখনও নীতির প্রচার হয় না। অনেকে বলিতেছেন, যুদ্ধ হইতেছে রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির, মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ফরাসী-বিপ্লব সাম্যতন্ত্রের, যুদ্ধ হইতেছে সামাজিক সাম্যতন্ত্রের আদর্শ রক্ষার জন্য—এই গেল রাষ্ট্রের দিক হইতে কথা। সমাজের দিক হইতে—যুদ্ধ হইতেছে পুরুষ-প্রধান সমাজের সঙ্গে, যে সমাজ-পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার সেই সমাজের। চিন্তার দিক হইতে,—যুদ্ধ হইতেছে জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে, কিংবা কাণ্ঠ-প্রদর্শিত অপরোক্ষবাদের সঙ্গে জীব-বিজ্ঞানের, বার্গসা প্রদর্শিত পরোক্ষবাদের। এক কথায়, বিদ্যা কি ধর্ম্ম ও নীতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিবে, না ধর্ম্ম ও নীতির সহযোগী হইবে, এই দুই আদর্শের। বৈজ্ঞানিক ভাবে দেখিতে গেলে, এই সব কথার কোন মানে নাই। ইউরোপের সকল দেশে কি ইংলণ্ড, কি জার্ম্মাণী, কি ফ্রান্সে, রাষ্ট্র, সমাজ, সভ্যতা, বিজ্ঞান-দর্শন লইয়া পরস্পর-বিরুদ্ধ নীতি সমানভাবে বহুকাল হইতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। সকল দেশেই ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের মূল সূত্রগুলি লইয়া বিরোধ সৃষ্ট হইতেই দেখা গিয়াছে। সমাজ-গঠনে, বৈষয়িক ব্যাপারে সুব্যবস্থায়, রাষ্ট্র-পরিবর্ত্তনে বিরোধের বেশ একটা মীমাংসা করিবার চেষ্টা লক্ষিত হইতেছিল। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল, প্রত্যেক দেশের অন্তর হইতে জাগ্রত স্বার্থসর্ব্বস্ব পরার্থভোগী সাম্রাজ্য-নীতি। এই নীতি অনুসারে প্রত্যেক জাতিই কামনা করিয়াছে, বিশ্বসভ্যতা আমার ছাঁচে গড়িয়া উঠুক, সকল স্বাতন্ত্র্য আমি ধুইয়া মুছিয়া দিয়া বিশ্বজগতের গায়ে আমি একা ছাপ মারিব, সব জাতিই আমার ছাপের দ্বারাই পরিচয় দিবে। সাম্রাজ্য-নীতি রাষ্ট্রের অবলম্বন হইলে যুদ্ধ ত অনিবার্য্য। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে নিজ নিজ শক্তির বিস্তার লইয়া দ্বন্দ্ব ত বাধিবেই। তাই দ্বন্দ্ব বাধিল, স্বার্থসাধন ও পরার্থভোগের ব্যাঘাত হইল বলিয়া, কোন মহনীয় নীতি ও ভাবুকতার জন্য নহে।

নব্য-রাষ্ট্রনীতি

বর্ত্তমান জীব-বিজ্ঞান, জীবন-সংগ্রামকেই অত্যন্ত বড় করিয়া দেখিয়াছে, জীবের পরস্পর প্রতিযোগিতাকেই লক্ষ্য করিয়াছে। জীবন-যাত্রায় জীবের পরস্পর নির্ভরতাও প্রণিধানযোগ্য। জীবন-যাত্রা শুধু জীবন-সংগ্রামের জয়পরাজয়ের ইতিহাস নহে, জীবের পরস্পর মৈত্রী ও বন্ধুত্ব স্থাপনের, দান-প্রতিদানেরও ইতিহাস। মানব-সভ্যতায় যতকাল সভ্যজাতি সমুদয়ের দান প্রতিদান না হইয়া জয়-পরাজয় লক্ষ্য হইবে, যতকালই সভ্যজাতি সমুদয় কেবলই আপনাদের প্রসারের সুযোগ খুঁজিবে, স্বার্থসাধনের সুযোগ খুঁজিবে,—দান করিবার নহে, পরার্থসাধনের নহে, ততকালই সাম্রাজ্য-নীতির প্রতিষ্ঠা, জীবন-সংগ্রাম ও যুদ্ধ।

বিশ্বসভ্যতায় তুমুল সংগ্রামের ভিতর দিয়া চিরশান্তি-প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে। সাম্রাজ্য-নীতির ভিতর দিয়া সাম্রাজ্যে সাম্রাজ্যে সংগ্রামের ভিতর দিয়া নূতন রাষ্ট্রনীতির জন্ম। নূতন জীব-বিজ্ঞানের মত নূতন রাষ্ট্রনীতি জীবনযাত্রা প্রণালীতে জয়-পরাজয়কে লক্ষ্য না করিয়া দান-প্রতিদানকেই লক্ষ্য করিবে। নূতন রাষ্ট্রনীতির আদর্শ হইবে প্রত্যেক জাতির—ইংরাজ ফরাসী হইতে চীন নীগ্রো হটেনটটেরও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা, তাহাদের বিশেষত্বের পুষ্টিবিধান করা। প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ও প্রত্যেকের বিশেষত্বের পুষ্টিবিধানের ফলে সকলেরই লাভ, সকলেরই মঙ্গল। সংগ্রামে, জয়-পরাজয়ে কাহারও লাভ, কাহার মঙ্গল নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্য-নীতি বর্ত্তমান যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া নব কলেবর ধারণ করিবে। নব্য রাষ্ট্রনীতি বর্ত্তমান যুদ্ধ-ঘটিত অশান্তি ও দুঃখ-বেদনা হাহাকারের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইবে। নব্য-রাষ্ট্রনীতি ছোট বড় হীন দুর্ব্বল জাতির স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা ও পুষ্টিবিধানের আদর্শ স্থাপন করিয়া বিশ্বসভ্যতায় নিরবচ্ছিন্ন শান্তি আনিয়া দিবে।

যুযুৎসু দর্শন

ভাবুক জার্ম্মাণী

বিশ্বজগৎ জার্ম্মাণজাতিকে এত কাল অন্যচক্ষে দেখিতেছিল। সে জার্ম্মাণজাতির নিকট বিশ্বজগৎ চিরকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছে। সে জার্ম্মাণজাতি জগতে বিজ্ঞান ও ভাবুকতার ধ্বজা উড়াইয়াছে, বিশ্ববাসীর নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ প্রদর্শক হইয়াছে, সে জার্ম্মাণ-জাতির সহিত কাহারও বিবাদ নাই, সে জার্ম্মাণজাতির সহিত চির-সৌহার্দ্দ্য না থাকিলে জাতীয় জীবন মিথ্যা, সভ্যতা মিথ্যা, পৃথিবীর ইতিহাস মিথ্যা হয়। ফিকটে, কাণ্ট, হেগেল, অথবা গেয়েটে ও সীলার বা লেসিঙ্গ ওয়াগ-নার জগদ্‌গুরু। তাঁহারা যদি পৃথিবীতে গুরুর আসন হইতে বিচ্যুত হন, তবে পৃথিবীর ইতিহাসকে মিথ্যা বলিতে কেহই সঙ্কুচিত হইবে না।

যুযুৎসু জার্ম্মাণী

ফিকটে ও কাণ্টের জার্ম্মাণী কি উপায়ে শেষে বিস্‌মার্কের জার্ম্মাণী হইল,—কি উপায়ে গত চল্লিশ বৎসর জার্ম্মাণজাতি তাহার সমস্ত নীতি, ও সমস্ত ভাবুকতাকে রাষ্ট্রীয় অধিকারবৃদ্ধির জন্য নিয়োগ করিয়াছে, তাহা একটা আলোচনার বিষয় সন্দেহ নাই। আমরা অনেকবার বলিয়াছি, জার্ম্মাণীতে সাহিত্য যে ভাবে সমাজকে গঠন ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, এরূপ সাহিত্যের ইতিহাসে আর দেখা যায় না। একজন সমালোচক বলিয়াছেন, Tne history of German literature presents us with the grandest example of what a popular literature can do

for a nation। আজ আমরা সেই কথাই মনে করিয়া আধুনিক যুধ্যমান জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রীয় আকাঙ্ক্ষা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব।

ভাবুক জার্ম্মাণীর বাণীপ্রচারক ফিক্‌টে

সেইত সেদিন জার্ম্মাণীর নাম পর্য্যন্ত ছিল না, সাম্রাজ্য ত দূরের কথা, রাজ্যও ছিল না। Holy Roman Empire কেবল একটা নাম মাত্র ছিল, জিনিষটা Holy'ও ছিল না, Roman'ও ছিল না, Empire 'ও ছিল না। তাহার পর একটা রাজ্য হইল। প্রুশিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু জেনা যুদ্ধের কথা কাহারই বা স্মরণ নাই? নেপোলিয়ন ত এক চালেই কিস্তি মাত করিলেন। ১৮০৭ আগষ্ট মাসে যখন নেপোলিয়ন প্রুশিয়ার সেনাবলকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, বার্লিন যখন তাঁহার কৃপার ভিখারী, তখন প্রুশিয়ার অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। কিন্তু শোচনীয় রাষ্ট্রীয় অবস্থার মধ্যে প্রতিভার কি অপূর্ব্ব বিকাশ! লর্ড হ্যালেডেন বলিয়াছেন—Since the best days of ancient Greece there had been no such galaxy of profound thinkers as those who were to be found in Berlin and Weimar and Jena, gazing on the smoking ruins which Napoleon had left behind him. Beaten soldiers and second rate politicians gave place to some of the greatest philosophers and poets that the world has seen for two thousand years. ঠিক সেই আগষ্ট মাসে ফিক্‌টে কনিগ্‌স্‌বার্গ হইতে বার্লিনে ফিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, লেক্‌চার আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, জার্ম্মাণী ত সকলের পদানত হইবেই, কারণ জাতির যাহা প্রাণ, যাহা জাতিকে সজীবতা দেয়, তাহা জার্ম্মাণীর নাই। জার্ম্মাণী তাহার জাতীয় আদর্শ ভুলিয়াছে, তাহার প্রাচীন ইতিহাসকে ভুলিয়াছে,—তাহার অতীতের

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার কথা ভুলিয়াছে। জার্ম্মাণী আবার তাহার প্রাচীন আদর্শ ফিরিয়া আনুক, জগতে জ্ঞান ও ভাবুকতার রাজ্য বিস্তার করুক, অমনি জার্ম্মাণজাতি বড় হইয়া দাঁড়াইবে।

Strive not to conquer with bodily weapons, but stand before your opponents firm and erect in spiritual dignity. Yours is the greater destiny,—to found an empire of mind and reason,—to destroy the dominion of rude physical power as the ruler of the world.

ফিক্‌টে যখন কলেজের ভিতর লেক্‌চার দিতেছিলেন, তখন বাহির হইতে নেপোলিয়নের সৈন্যগণের মহা গোলমাল শুনা যাইতেছিল; তবু তিনি গম্ভীর উদাত্তস্বরে এই বাণী প্রচার করিলেন,—তুমি পরাজিত হও নাই। অস্ত্র শস্ত্র দিয়া কেহ কখনও চিরস্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারে না,—তুমি বিশ্বে জ্ঞান ও ভাবুকতার সাম্রাজ্য স্থাপন কর—ইহাই তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য—পৃথিবীতে পশুবলের রাজ্য কয় দিনের?

ভাবরাজ্যের ধুরন্ধরগণ

ফিক্‌টে জাতির ভবিষ্যৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্য ভবিষ্যদ্বাণী হইয়াছে। জার্ম্মাণীকে কি ভাবে জগৎ সম্মান করিয়াছে তাহা New York Evening Postএর এই কয় লাইনে সূচিত হইবে—

The Germany of high aspirations and noble ideals, the Germany of intellectual freedom, the Germany to whose spiritual leadership every nation the world over is deeply in debt. Its flag has meant to us the flag of scientific knowledge planted farthest north in more fields of mental and Governmental activity than is

perhaps any other. It is the country of Fichte, Kant and Hegel, of Schiller and Goethe, of Korner and his fellow champions of German liberty in the wars for freedom just a century ago; of Carl Schurz and Siegel and Kinkel and their revolutionary comrades of 1848; of Schubert Schumann and Wagner; of Lessing, of Mommsen, of Helmholtz ann Sicmens.

ফিক্‌টে যখন তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে কাণ্টের দর্শনবাদের কথা উদয় হইয়াছিল।

ভাবরাজ্যের ভিত্তি—কাণ্টের স্বাধীনতাবাদ

কাণ্টের দর্শনে মানুষের আত্মার স্বাধীনতা প্রচারিত হইল। চিন্তায় ও কর্ম্মে মানুষ কাহারও অধীন নহে,। যখন বিবেক তাহাকে বলিবে,—তোমার ইহা কর্ত্তব্য, তখন মানুষ যদি মানুষ হয়, সে বলিবে—আমি পারিব এবং আমি করিব। পশুবলের অত্যাচার অথবা বিরুদ্ধ পারি-পার্শ্বিকের তাড়নার মধ্যে বিশুদ্ধ বুদ্ধির গৌরব, আত্মার স্বাধীনতা, categorical imperative of duty, কর্ত্তব্য সম্পাদনের মহত্ব ঘোষিত হইল।

পরাধীন জার্ম্মাণীর নিকট ভাবরাজ্যের এই স্বাধীনতাবাদ নূতন শুনাইল। ফিক্‌টের আকাঙ্ক্ষিত empire of mind and reason কাণ্টের এই স্বাধীনতাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কাণ্ট বিশ্বজগতের ইতিহাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—ইতিহাসের ক্রমবিকাশ বিশুদ্ধ ন্যায়-বুদ্ধিকে জগতের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। ব্যক্তির নৈতিক জীবন ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া ন্যায়-বুদ্ধি প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছে। কাণ্ট সেইজন্য রাষ্ট্রীয় হিংসা ও বৈরীকে অত্যন্ত

ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, রাষ্ট্রীয় শত্রুতা সমাজ-জীবনে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হইতে দিবে না, বিশ্বমানবের সেই পরম কল্যাণের অন্তরায় থাকিবে।

So long as states spend all their powers in vain and violent efforts at aggrandisement, and thus ceaselessly hinder the slow toil of the education of the inner life of their citizens, nothing of the kind can be expected. All good that is not based on the highest moral principle is nothing but empty illusion and glittering misery.

কাণ্ট অন্তর্জ্জাতীয় শান্তির জন্য এত ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন যে, তিনি একটা অন্তর্জ্জাতীয় সন্ধির সূত্রগুলি একে একে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, একদিন না একদিন সমস্ত জাতি তাহাদের হিংসা ও শত্রুতা ভুলিয়া সে সূত্রগুলি অবলম্বন করিবে।

কাণ্ট ব্যক্তিপূজার দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই তিনি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, রাষ্ট্র ব্যক্তির শুদ্ধ বিবেক-বিকাশের সহায় হইবে, ন্যায়প্রতিষ্ঠার বিধান করিবে। ফিক্‌টেও বলিয়াছিলেন, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যক্তির স্বত্ব রক্ষা করা—the assurance of the rights of all men is the only general will. তখন এ যুক্তির প্রয়োজন ছিল। সব দেশের সমাজ তখন রাষ্ট্রের অত্যাচারকে ভয় করিত—রাষ্ট্রও তখন ব্যক্তির স্বাধীনতা লোপসাধনের প্রয়াসী ছিল। ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লব হইতে ব্যক্তিপূজা আরম্ভ হইয়াছিল, ব্যক্তির স্বত্বের উপর অধিক ঝোঁক পড়িয়াছিল। তাই কাণ্ট ও ফিক্‌টে দুই জনেরই রাষ্ট্রনীতি ব্যক্তিপূজার দোষ এড়াইতে পারেন নাই। ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লবপ্রসূত ভাব ও আদর্শ যাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল, তিনিই পারেন নাই। ইহা তাঁহাদের দোষ নহে। দোষ ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লবের ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রের নির্য্যাতনের।

হেগেলের প্রচারিত নব্য রাষ্ট্রনীতি

হেগেল, কাণ্ট ও ফিক্‌টের ব্যক্তিপূজাদোষ সংশোধন করিলেন। ফরাসী-বিপ্লবপ্রসূত ব্যক্তিপূজার প্রতিরোধ করিলেন। হেগেল বলিলেন, রাষ্ট্র ব্যক্তির সমষ্টি নহে। রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যক্তির স্বত্বরক্ষা বিধানের জন্য হয় নাই। রাষ্ট্রই স্বত্ব প্রদান করে। ব্যক্তি রাষ্ট্রের অধীনে থাকিয়া রাষ্ট্রীয় জীবনস্রোতে তাহার জীবন প্রবাহিত করিয়া, রাষ্ট্রের নিকট একবারে আত্মসমর্পণ করিয়া আপনার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করে। রাষ্ট্রীয় জীবনস্রোতে যে আপনাকে যত ডুবাইবে, সে ততই আপনার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করিবে। হেগেলের রাষ্ট্র নীতির মূল কথা ইহাই। The individual's particular satisfactions, activities and way of life have in this authenticated substantive principle their origin and result. The state s the highest and noblest realisation of the moral idea.

হেগেলের প্রভাব

রাষ্ট্র তোমাকে যে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে বলে, সেই কর্ত্তব্য সম্পাদনের দ্বারা তুমি তোমার ক্ষুদ্রত্ব ও স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিতে শিক্ষালাভ করিবে—যতই তুমি আপনা ভুলিয়া রাষ্ট্রীয় জীবনের ভিতর আপনার ব্যক্তিত্ব অনুভব করিতে থাকিবে, ততই তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি।

হেগেল যে রাষ্ট্রনীতি প্রচার করিলেন, রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ যে ভাবে বিশ্লেষণ করিলেন, তাহাই আধুনিক জার্ম্মাণ সমাজের যাহা কিছু ভাল—যাহা কিছু মহৎ, তাহারই মূলে। হেগেলের এই নূতন শিক্ষায় সমগ্র সমাজ এক নূতন প্রাণ পাইল, নীতি ও ধর্ম্মের সহিত ব্যক্তি ও রাষ্ট্র এক নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করিল। জার্ম্মাণজাতি এক নূতন বলে বলীয়ান্, এক নূতন ভাবুকতায় ভাবুক হইল।

ফিউরবাক ও সমাজতন্ত্রবাদে ভাবুকতার প্রতিরোধ

ভাবুকশ্রেষ্ঠ হেগেলের চিন্তাধারা সমানভাবে বহুকাল সমাজের ভিতর দিয়া বহিতে পারে নাই। হেগেলের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সমাজে আর একটী স্রোত আসিল। ফিউরবাক বলিলেন, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই বাস্তব, যাহা ভাবাত্মক তাহা বাস্তব নহে। হেগেলের ঠিক বিপরীত ভাব। আর এক দিকে কারল-মার্ক্স ও এঙ্গেল হেগেলের বিপরীত ভাবের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, সমাজের বৈষয়িক জীবনধারাই সকল প্রকার সামাজিক অভিব্যক্তির মূলে,—বিজ্ঞানালোচনা, ধর্ম্মপ্রচার, আর্টের বিকাশ, দর্শনপ্রচার—সবই বৈষয়িক অবস্থার উপর নির্ভর করে—ভাবুকতা ত্যাগ করিয়া একবারে আহার-পরিচ্ছদের ব্যাপারকে সমাজের ক্রমবিকাশের কারণ তাঁহারা নির্ণয় করিয়া দিলেন। ফলে হেগেলের বিপরীত ভাব জড়বাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল।

রাষ্ট্রীয় উন্নতি ও কূটনীতি

আরও এক কারণে হেগেলের ভাবুকতার প্রতিরোধ হইল। রাষ্ট্রীয় জগতে প্রুশিয়া সৈন্যবলের সাহায্যে খুব শক্তিমান্ হইয়া উঠিল। বিস্মার্ক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ম্যাকিয়াভেলী নীতি অবলম্বন করিলেন। প্রুশিয়া তাহার সেনা-শক্তির সাহায্যে প্রথমে সমগ্র জার্ম্মাণীর উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিল, তাহার পর সমগ্র ইউরোপে প্রুশিয়া আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করিল। পৃথিবীতে এত শীঘ্র কোন দেশ এত বড় হয় নাই। এমন শক্তির বিকাশ এত কম সময়ের মধ্যে কখনও দেখা যায় নাই। রাষ্ট্রীয় উন্নতির চরম সীমানা—সেই সীডানের যুদ্ধক্ষেত্রে যখন তৃতীয় নেপোলিয়ন বন্দী হইলেন। বিধ্বস্ত পদানত ফ্রান্স প্রথম নেপোলিয়নের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

এমন উন্নতি এত শীঘ্র লাভ করিয়া কোন জাতিই মাথা ঠিক রাখিতে পারে না। বিস্মার্কের যুগে মহনীয় ভাবুকতা কখনই বিকাশ লাভ করিতে পারে না। উইণ্ডেলবাণ্ড (Windelband) ঠিক বলিয়াছেন,—the age of Bismark produced no great poetry and no adequate philosophy.

যুযুৎসু জার্ম্মাণীর গুরু—ট্রিট্স্‌কে

ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের পাঁচ বৎসর পর একজন নূতন লোক জার্ম্মাণ জাতির নিকট নবযুগপ্রবর্ত্তকরূপে আসিলেন। তিনি বার্লিনের অধ্যাপক ছিলেন, কুড়ি বৎসর ধরিয়া জার্ম্মাণীর যুবকসমাজ তাঁহার আলোচনা ও উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল—ফিক্‌টের পর এমন করিয়া কেহ কখনও যুবকদিগকে মাতাইতে পারে নাই। তাঁহার নাম ট্রিট্‌স্‌কে (Treitschke)। তিনি জার্ম্মাণজাতিকে তাহার অতীত অনুসরণ করিয়া একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ গঠন করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। প্রুশিয়া সমগ্র জার্ম্মাণীর উপর প্রভুত্ব স্থাপন করুক এবং জার্ম্মাণী তাহার সেনাবলের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব স্থাপন করুক বার্লিনের অধ্যাপক এই আদর্শ অদম্য তেজের সহিত প্রচার করিলেন। ক্ষুদ্র রাজ্য অক্ষম রাজ্য, তাহার ত বিনাশসাধন স্বাভাবিক—That the strong should triumph over the weak is an inexorale law of nature. সুদূরে রাজ্য স্থাপনের প্রয়োজন কি? নিকটেই ত হলাণ্ড রহিয়াছে তৈয়ারী রাজত্ব লইলেই হইল। "Why talk of founding colonies. Let us take Holland; then we shall have them ready-made." রাজনীতিতে দয়ার কথা নাই। We are only too early seduced by the fine phrases of tolerance and enlightenment. সামুদ্রিক শক্তি ভিন্ন কোন জাতি আজ কাল

সাম্রাজ্যস্থাপন করিতে পারে না,—ইংরাজজাতি সমুদ্রে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী, কিন্তু ইংরাজের সামুদ্রিক শক্তিবিকাশ সে ত গত শতাব্দীর ঘটনা "obviously belongs to the century gone by." এই শতাব্দীতে জার্ম্মাণী তাহার সামুদ্রিক শক্তি বিস্তার করিয়া জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপন করিবে—the future upon the water.

এই আদর্শে সমগ্র জার্ম্মাণ সমাজ মাতিয়া উঠিল। নীতি ধর্ম্ম সবই জাতীয় অভ্যুত্থানের সুযোগবিধানের জন্য মানুষের কল্পনাসামগ্রী—এই ভাব প্রতিপত্তি লাভ করিল। মহনীয় ভাবুকতা লোপ পাইল। কাণ্ট, গেয়েটে, ফিক্‌টে, হেগেলের ভাবুকতা অতীতের গর্ভে বিলীন হইল। ট্রিটস্‌কের যুগ ভাবুকতার যুগ নহে,—বাস্তব উন্নতির যুগ। হাইন (Heine) বলিয়াছিলেন, লেসিঙ্গ, কাণ্ট—তাঁহারা ত কিছুই করিতে পারেন নাই—কেবল একটা ভাবরাজ্য আকাশে গড়িয়াছিলেন,—Nothing excpt the empire of the air. ট্রিটস্‌কের যুগে জার্ম্মাণ জাতি বাস্তব রাজ্য গঠন করিতেছিল।

নাস্তিকতা

বিজ্ঞানের উন্নতি, সেনাবলের প্রতিপত্তি, ব্যবসায়-প্রচার সকলেরই ফলে জার্ম্মাণ সমাজে আস্তিক্যবোধ হ্রাস পাইতে লাগিল।

র‍্যাঙ্ক (Ranke) দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, Every thing is falling to pieces ; no one thinks of anything but commerce and money. আমাদের সব গেল ; কেহ টাকাকড়ি ছাড়া আর অন্য কিছু ভাবে না। মম্‌সেনও স্বজাতিকে সাবধান হইতে বলিয়াছিলেন—Have a care lest in this country which has been at once a power in arms and a power in intelligence, the intelligence should vanish and nothing but the pure military state should remain.

খৃষ্টীয় নীতি ও ধর্ম্মে অনাস্থা

বৈষয়িক ক্ষেত্রে পারিবারিক শিল্পপ্রণালীর পরিবর্ত্তে কারখানা শিল্প-প্রচার জাতীয় নৈতিক অবনতির আর একটি কারণ হইল। ওয়াল্‌টার ক্লাসেন (Walter Classen) নামক একজন জার্ম্মাণ লেখক জার্ম্মাণীর শ্রমজীবিগণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "When a great part of our population changed their abode from the farming country to the industrial centres of great cities, all the old convictions of the household, its religion, its morality, remained behind, or during the subsequent migrations, perished altogether. What happened in the period from 1870-90 was that men first of all lost contact with the old ecclesiastical patriarchal point of view."

পল্লী ত্যাগ করিয়া শ্রমজীবিগণ সমৃদ্ধিশালী নগরের কলকারখানায় কাজ করিতে আসিলে, সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন খৃষ্টানী গৃহনীতির লোপসাধন হইল, the collapse of christian family discipline দেখা গেল।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের বাইবেল-সাহিত্য সমালোচনা খৃষ্টানধর্ম্মের কুসংস্কারের বিনাশ সাধন করিতে যাইয়া খৃষ্টানধর্ম্মের প্রতি উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদিগের মধ্যে একটা অনাস্থা ও অবিশ্বাসের ভাব আনয়ন করিল। শ্রমজীবীদের মধ্যে বৈষয়িক অবস্থা পরিবর্ত্তনের ফলে খৃষ্টান নীতির প্রভাব কমিয়া গিয়াছে, এক্ষণে বাইবেল-সমালোচনা মধ্যবিত্ত সমাজে ঘোর অবিশ্বাসের সৃষ্টি করিল।

সোপেনহরের দুঃখবাদ

এই অবিশ্বাস, ধর্ম্মের প্রতি এই অনাস্থার যুগে সোপেনহরের দুঃখবাদের উৎপত্তি। সমগ্র জাতির হৃদয়ে খৃষ্টাননীতির প্রতি শ্রদ্ধা লোপ

পাইয়াছিল বলিয়া সোপেনহরের দুঃখবাদ এত নিবিড়ভাবে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় শক্তির বিকাশ, রাষ্ট্রে সেনাবলের প্রতিপত্তি, ব্যবসায়িক উন্নতি, ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে শ্রমজীবিগণের দারিদ্র্য ও নির্য্যাতন—বিস্মার্কের কূটনীতি ও প্রুশিয়ার দম্ভ, বিজ্ঞানের উন্নতি ও ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতি তীব্র আক্রমণ, ব্যবসায়ীর ধনৈশ্বর্য্য ও সমাজতন্ত্রবাদের অভিযোগ সকলে মিলিয়া জার্ম্মাণজাতির প্রাচীন ধর্ম্মনীতিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। একটা ধর্ম্ম, একটা নীতি লোপ হইতেছে, এমন সময়ে সোপেনহরের দুঃখবাদ সকলের হৃদয়ের শূন্যতা ঘিরিয়া বসিল। খৃষ্টানের বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে সোপেনহরের দুঃখবাদ জার্ম্মাণজাতির হৃদয়ের শূন্যতা দূর করিল।

দুঃখবাদ কখনই কোন জাতিকে সবল করে না, কোন সবল জাতি দুঃখবাদকে অধিক কাল ধরিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। তাই নীট্‌শে (Nietzche) যখন তাঁহার নূতন নীতি প্রচার করিলেন, তখন ইহা অচিরেই জর্ম্মাণজাতির হৃদয়ে সোপেনহরের দর্শনের স্থান অধিকার করিল।

নীট্‌শের দুঃখবাদ-প্রত্যাখ্যান

সোপেনহরের দুঃখবাদ খৃষ্টান নীতির স্থান অধিকার করিতে পারে নাই, শুধু ইহা "নেতি নেতি" এই কথাই বলিয়াছিল, জর্ম্মাণজাতি খৃষ্টান নীতি ত্যাগ করিয়া তখনও নূতন কিছু একটা পায় নাই, শুধু দুঃখবাদের আঁধারে ঝাঁপ দিয়াছিল। এই অন্ধকারে আলোক দেখাইলেন নীট্‌শে। তাঁহার দর্শন শুধু নেতি নেতি নহে, তাহাতে জর্ম্মাণজাতি একটা সুমহান্ কর্ত্তব্য-সাধনের জন্য আহ্বান শুনিল।

দুঃখবাদ যখন একটা রোগের মত জার্ম্মাণজাতির হৃদয়কে অবসন্ন করিতেছিল, তখন নীট্‌শে একবারে সম্পূর্ণ নূতন কথা, এক অভিনব আশার বাণী প্রচার করিলেন। দয়া দাক্ষিণ্য করুণা—সে ত অনেক

সময়েই দুর্ব্বলতার নামান্তর মাত্র। জগতের দুঃখ দেখিয়া অনেক সময়ে করুণার উদ্রেক হয়, করুণা হইতে দুঃখবাদের উৎপত্তি, এবং দুঃখবাদের মূল কারণ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। নীট্‌শে এই বলিয়া সোপেনহরের দুঃখবাদকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি বলিলেন, দয়ার দ্বারা করুণার দ্বারা অভাগারা রক্ষা পায় নাই, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে না—"Not your pity but your bravery has saved hitherto the unhappy." করুণার উদ্রেক হইলে মানুষ দুর্ব্বল হয়, তুমি করুণা ত্যাগ কর। Pity is dangerous. যাহারা অক্ষম—তাহাদের বিনাশ সাধন কর—সর্পদষ্ট অঙ্গুলির মত সমাজশরীর হইতে তাহাদিগকে কাটিয়া ফেল।

নীট্‌শে-প্রবর্ত্তিত আভিজাত্য ধর্ম্ম

এতকাল সমাজ মানুষের ঐক্যকেই মানিয়া আসিয়াছে। খৃষ্টানধর্ম্ম ইউরোপে মানুষের মধ্যে ঐক্যভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে ফরাসীবিপ্লবের ফলে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমাজ-জীবনেও সমাজ-তন্ত্রবাদ, নিহিলিজম্, আনার্কিজম্ এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে। ফলে জাতির অবনতি হইতেছে। যাহারা অক্ষম, তাহারা সমাজে পুষ্ট হইতেছে, এবং সক্ষমেরা উন্নতি লাভ করিতেছে না। জাতির উন্নতি সাধন করিতে হইলে সক্ষমদিগের উন্নতি সাধন করিতে হইবে, করুণাকে ত্যাগ করিতে হইবে, খৃষ্টান নীতি বিসর্জ্জন দিতে হইবে, অক্ষমদিগের বিনাশ সাধন করিতে হইবে। Live dangerously তুমি বিপজ্জনক জীবন অতিবাহিত কর, নীট্‌শে জার্ম্মাণ জাতিকে এই উপদেশ দিলেন। তবেই তুমি পৃথিবীতে বড় হইবে, অন্য সকল জাতি অপেক্ষা বড় হইবে।

মানুষ আজকাল দুর্ব্বল নির্জ্জীব হইয়াছে,—রুগ্ন, অক্ষমদিগকে রক্ষা করিতে যাইয়া সক্ষম লোকও দুর্ব্বল হইয়াছে। মানুষের জীবনে তা°

আনন্দ নাই, উত্তেজনা নাই। "We have stimulated the egoism of the sickly and degenerate, and by holding fast in life great members of misshapen beings, have given to existence itself a gloomy and questionable aspect."

অতি-মানুষপূজা

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন অনুসারে অক্ষমদিগের বিনাশসাধন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মানুষ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রতিরোধ করিয়া অক্ষমদিগকে রক্ষা করিতেছে। নীটশে মানুষকে সাধারণ শ্রেণীর উপরে উঠিতে বলিতেছেন। সাধারণ মানুষের বিনাশসাধন করিয়া অতি-মানুষ সৃষ্ট হইবে এবং এই অতি-মানুষ (Superman) ভগবানের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সৃষ্টি হইবে। Spare not thy neighbour. Man (present man) is something that must be surpassed.

খৃষ্টের সেবা ও আত্মত্যাগের ধর্ম্ম ত্যাগ না করিলে বর্ত্তমান সভ্যতার উন্নতি নাই। নীটশে আত্ম-প্রতিষ্ঠার ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। খৃষ্টের পরিবর্ত্তে নীটশে Super-man অতি মানুষের পূজা প্রবর্ত্তন করিলেন।

রুডল্‌ফ অয়কেন বলিয়াছেন, যে জার্ম্মাণ সৈনিকগণ এখন যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদের সকলেরই নীটশের বই কণ্ঠস্থ।

সমগ্র জার্ম্মাণজাতি এখন অতি-মানুষপূজা বরণ করিয়াছে। এই অতিমানুষপূজার ফলে জার্ম্মাণেরা আপনাদিগকে এখন অতি-জাতি মনে করিয়াছে,—আপনাদিগকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী, এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে সর্ব্বাপেক্ষা সমুন্নত মনে করিয়াছে। এই অতিমানুষপূজার ফলে আজ জার্ম্মাণজাতি সমগ্র পৃথিবীকে আপনার বাহুবল দ্বারা সুসভ্য করিবার বাসনা স্পর্দ্ধার সহিত জ্ঞাপন করিয়াছে।

আমাদিগকে কি এই অতি-মানুষপূজার দোষগুণ বিচার করিতে

হইবে ? অতি-মানুষপূজা আত্ম-প্রতিষ্ঠার সাধনা। অতি-মানুষপূজা আর শক্তি-পূজায়* এক দিক্ হইতে দেখিতে গেলে বিশেষ প্রভেদ নাই। Super-man সে এক হিসাবে সিদ্ধ তান্ত্রিক। বৈষ্ণবধর্ম্মে ও শাক্তধর্ম্মে যাহা প্রভেদ, খৃষ্টধর্ম্ম ও অতি-মানুষপূজায় ঠিক সেই প্রভেদই লক্ষ্য করিব। জার্ম্মাণীর অতি-মানুষপূজা এক হিসাবে আমাদের শক্তি-পূজার নামান্তর মাত্র।

অতি-মানুষপূজা ও শাক্ত ধর্ম্ম

কিন্তু জার্ম্মাণী অতি-মানুষপূজায় ব্যক্তি আপনাকে কোন নিয়মের অধীন স্বীকার করে না; কিন্তু তান্ত্রিক আপনাকে ভগবানের যন্ত্র বলিয়া অনুভব করেন। তিনি ঈশ্বরের নিয়মের অধীনতা স্বীকার করেন। তাই তান্ত্রিকের শক্তি সৃষ্টিস্থিতির শক্তি এবং অতি-মানুষের শক্তি প্রলয়ের শক্তি। অতি-মানুষ শক্তি অর্জ্জন করিয়া আপনার শক্তি-প্রতিষ্ঠায় মাতোয়ারা থাকেন, দীনহীন আর্ত্ত অনাথদিগের অত্যাচার করিয়া আপনার গৌরব অনুভব করেন। তান্ত্রিক শক্তি অর্জ্জন করিয়া শক্তিময়ী শক্তি-ভূতার নিকট প্রার্থনা করেন—

শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

অতিমানুষের শক্তিকে প্রলয়ের শক্তি বলিয়াছি। এই অতিমানুষ আজ জগতে প্রলয়কাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে। বহু শতাব্দীর সাধনার দ্বারা যে বিজ্ঞান যে বিদ্যাবুদ্ধি যে দর্শন যে ইতিহাসকে পাওয়া গিয়াছে, সবই এখন মানুষের বিরুদ্ধে—সভ্যতার বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইতেছে। বিজ্ঞান—তাহার ত একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছে মানুষকে সেবা করা নহে, তাহাকে হত্যা করা।—Science always fostered as the benefactress of man has become the handmaid of destruction. With

the help of secrets won from nature by devoted minds men are making the earth into a shambles. সামাজিক শক্তি এখন সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দয়ভাবে সর্ব্বাপেক্ষা অমানুষিক উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইতেছে।—Social organisation, achieved at immense cost by generations of humanitarian effort, is a means to the concentration of stupendous forces on the most inhuman of ends. মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি এতদিন সত্য আবিষ্কারের জন্য নিয়োজিত হইতেছিল, আজ কূট নীতি সৃজন করিয়া ধ্বংসের পথ আবিষ্কার করিতেছে। Intellect trained for the discovery of truth by elaborate systems of education takes service under the Father of lies, calls itself "diplomacy" and lures nations to ruin. সব জ্ঞানই এখন ধ্বংসের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে।—Knowledge of human nature, knowledge of history, knowledge of the laws which govern society, are so many weapons ready to the hands of world-wide conspirators; they are fools for the construction of enormous ambuscades.

সভ্যতার কি শোচনীয় পরিণাম! অনেকে আশা করিয়াছেন, জার্ম্মাণ-জাতির অতি-মানুষপূজা ও অতি-জাতির স্পর্দ্ধা যুদ্ধের দ্বারা একবারে সমূলে বিনষ্ট হইলে সভ্যতা রক্ষা পাইবে, বিশ্বজগতের পক্ষে মঙ্গল হইবে। কিন্তু যুদ্ধ বা জয়পরাজয়ের দ্বারা সভ্যতা রক্ষা পাইবে না প্রতিকূল শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শক্তি আরও উদ্দাম হইবে। অতি-মানুষকে হঠাইতে গেলে অতি-মানুষ আরও উগ্র—আরও ভয়ঙ্কর হইবে। অতি-মানুষ হঠিলে তাহার দর্প ও স্পর্দ্ধা বিনষ্ট হইবে না, তাহার অহঙ্কার সুপ্ত থাকিবে।

আবার নূতন খৃষ্ট নূতন বেশে আসিয়া মৈত্রী, করুণা ও প্রেমের বাণী

প্রচার না করিলে, ইউরোপকে পুনরায় নূতন সেবাধর্ম্মে না দীক্ষিত করিলে অতিমানুষের বিনাশ নাই, ইউরোপের শান্তি নাই, জগতের মঙ্গল নাই, সভ্যতার মুক্তি নাই। নূতন খৃষ্ট কোথা হইতে আসিবেন, কবে আসিবেন? তাঁহার বোধনমন্ত্র কাঁহারা উচ্চারণ করিয়াছেন, মঙ্গল-ঘট কাঁহারা স্থাপন করিয়াছেন?

পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মঘাত

সভ্য ও বর্ব্বর

বর্ত্তমান সভ্যতা, আমরা তোমার শিষ্য। চীন জাপান তোমার শিষ্য। এসিয়া আফ্রিকা অষ্ট্রেলেসিয়া তোমার শিষ্য। সমগ্র জগৎ তোমার শিষ্য। তুমি আপনাকে জগদ্‌গুরু বলিয়াছ। সমগ্র জগৎ তোমাকে গুরুর বরণীয় পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছে।

আমরা সকলে অসভ্য। তুমি বলিয়াছ, তুমি অসভ্যকে সভ্য করিবে, অজ্ঞানকে জ্ঞানচক্ষু দিবে। তুমি ধর্ম্ম শিখাইবে। অন্ধকার হইতে আলোয় লইয়া যাইবে। অনন্ত নরকযাতনা হইতে জগৎকে উদ্ধার করিবে। তুমি বলিয়াছ, তুমি বিজ্ঞান শিখাইবে। তুমি বৈজ্ঞানিক শিল্প-ব্যবসায়প্রণালী শিখাইবে। তুমি প্রজাতন্ত্র শিখাইবে। তুমি প্রজাতন্ত্রা-নুমোদিত সমাজ-তন্ত্র-গঠন-প্রণালী শিখাইবে।

সভ্যতার দম্ভ

আমরা অজ্ঞ, অশিক্ষিত, অর্ব্বাচীন। তুমি সভ্য, শিক্ষিত, প্রবীণ; বয়সে প্রবীণ নহ, বুদ্ধিতে প্রবীণ। তোমার বিদ্যাবুদ্ধি কৌশলের আমরা ত ইয়ত্তা পাই না। তুমি কি না করিয়াছ! এই ত কয়বৎসর হইল তুমি এখানে আসিয়াছ। তুমি যেন বাজীকর। দিগন্তবিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও বনশ্রেণীর ভিতর তুমি নগর সৃষ্টি করিলে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানা স্থাপন করিলে। তুমি কল আনিলে, যন্ত্র আনিলে,—তাহারা আমাদের লক্ষ জনের মত কাজ করিতে লাগিল। আমরা জানিতাম সেই দৈত্য দানবের কথা। এক রাত্রে তাহারা প্রভুর আদেশমত সুন্দর সৌধ-

উপবন সুশোভিত নগর নির্ম্মাণ করিয়া দিত। কিন্তু ইহা ত গল্প নহে, রূপকথা নহে। ইহা ত আমাদের চক্ষের সম্মুখে ঘটিল। যেখানে বন ছিল সেখানে কত নগর নগরী নির্ম্মিত হইয়া গেল, আকাশ কারখানার ধূমে ভরিয়া গেল, চারিদিক কারখানার শব্দে মুখরিত হইল। অগণ্য শ্রমজীবী তোমার নিকট আসিল। তুমি তাহাদিগকে সাদরে ডাকিয়া তোমার কার্য্যে নিযুক্ত করিলে। আমরা আমাদের শ্যামল ক্ষেত্র লইয়াছিলাম। আমরা ধান্যসম্পদের মধ্যে কমলার কৃপা-ভিখারী ছিলাম। কমলা এখন ধান্য-সম্পদ ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট কারখানায় অর্ঘ্য পাইতেছেন। তুমি নিশ্চয়ই কিছু ভোজবাজী জান—কমলাকে তুমি নিশ্চয়ই কোন মন্ত্রে বশীভূত করিয়াছ, তাহা না হইলে কমলা কি অন্নকোট ত্যাগ করিয়া তোমার কারখানার তেল, ধূম ও গন্ধের মধ্যে বাস করিতে পারেন? তুমি বাজীকর,—আমরা তোমার শক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত ও ত্রস্ত হইয়াছি।

তুমি আবার পাতালে প্রবেশ করিয়াছ। পাতালকে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া তুমি সেখানেও কমলার কৃপালাভ করিয়াছ। অতলস্পর্শী সমুদ্র-গর্ভে তুমি ডুবারী হইয়া রত্নপ্রবালের খোঁজে ফিরিয়াছ। তুমি ব্যোমচারী হইয়া আকাশমার্গে ভ্রমণ করিয়া আনন্দ পাইয়াছ।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম সকলকেই তুমি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছ। তাহারা যেন তোমারই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতেছে, তোমার নিকট তাহারা আত্মবিক্রয় করিয়াছে।

তুমি থাক কোথায়, আর আমরা কোথায়! তুমি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়া এখানে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছ। শুধু আমাদের এখানে নহে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র তোমার জয়পতাকা উড়িতেছে, আফ্রিকায় উড়িতেছে, অষ্ট্রেলেসিয়ায় উড়িতেছে। ল্যাটিন আমেরিকায় তুমি প্রভু নহ, কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকাই আবার তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান স্বেচ্ছা-

সেবক। এক তুমি প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পার নাই,—যাহাদিগকে গোঁড়া এসিয়াবাসী বলিয়া ঠাট্টা কর তাহাদের উপর। তুমি আসমুদ্রক্ষিতীশ, আনাকরথবর্ত্মী,—তোমার যানই বা কত প্রকার,—রেল, ট্রাম, মটর, জাহাজ, আকাশ-তরী,—আবার তুমি এমন রথ তৈয়ারী করিয়াছ যাহা আকাশেও চলে, জলেও চলে পাতালেও চলে। তুমি কি দ্রুতগতি, তুমি এক মুহূর্ত্তে এক যোজন অতিক্রম কর – তোমার নিকট কিছুই সুদূর নহে, সবই অদূর। পৃথিবী ছাড়িয়া তুমি আবার মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছ। তুমি কি স্বর্গের কোন দেবতা ?

চপলা কমলা তোমার গৃহের অচলা হইয়াছেন। তোমার ভাণ্ডারী হইয়াছেন স্বয়ং কুবের। বিশ্বকর্ম্মা তোমার পুরাতন ভৃত্য। তুমি ইন্দ্রের পদে অধিষ্ঠিত। তোমার ঐরাবৎ হইয়াছে, এক একটি জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্য এবং তুমি তোমার বাহনে চড়িয়া বিশ্ববাসীকে শাসন করিতেছ।

বিপরীত বুদ্ধি

তুমি কাল গৌরবে বলিয়াছিলে ইন্দ্রের শাসন দণ্ডনীয় ! আজ একি ? পরের শাসন ত দূরে যাক্, তুমি নিজেকেই যে শাসন করিতে পারিতেছ না। তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, তোমার বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, তুমি কাণ্ড-জ্ঞান হারাইয়াছ। তুমি আত্মঘাতী হইতেছ। তোমার বিদ্যাবুদ্ধি আজ যে তোমাকেই কলকৌশলে হত্যা করিতেছে। তোমার শক্তি আর ত তোমার করায়ত্ত নাই, সে যে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভীষণ নিষ্ঠুরভাবে নিয়োজিত। তুমি কত শতাব্দী ধরিয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়াছ, সে শক্তি কি শুধু তোমার নিজের বিনাশসাধনের জন্য ?

তোমার বিজ্ঞান যাহা এতকাল তোমাকে কত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়াছে, কত বিলাসের উপকরণ জোগাইয়াছে, আজ সে সব ভুলিয়া তোমাকে নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করিতে উন্মুখ। তোমার ধীশক্তি,—যাহাকে এতকাল

কত সত্যানুসন্ধানকার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়া তুমি মার্জ্জিত করিয়াছ, আজ ডিপ্লোমাসি মিথ্যা চটুলতা কূটনীতিতে পরিণত হইয়া তোমাকে ধ্বংসের পথ দেখাইতেছে। তোমার আর্ট জীবনের মাধুর্য্য প্রকাশ না করিয়া আজ সে ধ্বংসের চিত্রবৈচিত্র্যের ভাবে বিভোর। তোমার সঙ্গীত-আজ মরণের উদ্দাম আবেগে করুণ কঠোর,—মর্ম্মস্পর্শী। তোমার নীতি, তোমার ধর্ম্ম, তোমার দর্শন, হিংসা বৈরী, শত্রুতাকে ন্যায় ও প্রেমের পরিবর্ত্তে বরণ করিয়াছে।

তুমি পূজার উপকরণ সাজাইয়া সয়তানকে পূজার আসনে বসাইলে কেন? তোমার জীবনের ইতিহাস—সে কত বিপুল প্রয়াস, কত বিরাট্ আয়োজনের ইতিহাস, সেই ইতিহাস সে প্রয়াস, সে আয়োজনের কি এই পরিণাম,—আত্মহত্যা। তুমি আত্মঘাতী হইলে কেন?

কে এই প্রশ্নের উত্তর দিবে।

তুমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে না। তুমি এখন হতবুদ্ধি, কার্য্য-কারণ নির্ণয় করিতে অসমর্থ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া দুষ্কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছ। তাহা ছাড়া তুমি তোমার জীবনকে খুঁটিনাটি করিয়া দেখিতে শিখ নাই, শিখিলে এ শোচনীয় পরিণাম তোমার হইত না।

ইতিহাসের সাক্ষ্য

তুমি না পারিলে এ প্রশ্নের কে উত্তর দিবে? পারিবে একজন। বিশ্বমানব। যাহাকে তুমি এখন তোমার পদতলে নিষ্পেষিত করিতেছ। যাহার নিকট তুমি নিতান্ত অর্ব্বাচীন। সে-ই কেবল এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ। তাহার ভাষা সরল, স্পষ্ট, অকৃত্রিম; সে ভাষার নাম ইতিহাস।

বিশ্বমানবের ভাষায় বাক্‌চাতুরী নাই, কূটনীতি নাই, চটুলতা নাই। ইতিহাস সোজাসুজি স্পষ্ট করিয়া তোমার মুখের উপর বলিয়া দিতেছে,—

তুমি এই গত তিন শত বৎসর ধরিয়া এমন ভাবে আপনার জীবন গঠন করিয়া আসিয়াছ, যাহাতে তোমার এই শোচনীয় পরিণাম হইবেই। মধ্যযুগে তুমি ছিলে একরকম ভাল। তখন বুদ্ধি, জ্ঞান,—বিদ্যা, সকলেরই তুমি কিছু কিছু অনুশীলন করিতে। তখন তোমার সাহিত্যে ভাবুকতা ছিল, চিত্রাকলায় অতীন্দ্রিয়তা ছিল, শিল্পব্যবসায়ে সংযম ছিল,—সমাজে প্রকৃত শান্তি ছিল। বিবেক শ্রদ্ধাভক্তি তখন বুদ্ধিকে অসংযত হইতে দেয় নাই। তাহার পর তোমার মতিভ্রম হইল সে এখন হইতে প্রায় তিনি শতাব্দী পূর্ব্বের কথা—কেন যে হইল তাহা বলা কঠিন। কেহ মনে করেন, এটা রেনেসাঁর সেই গ্রীকসভ্যতানুকরণের বিষময় ফল। বার্গসাঁ কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা বলিয়াছেন এটা historical accident—তুমি বুদ্ধিকেই বড় বলিয়া ভাবিলে। তুমি বলিলে the Age of Enlightenment আরম্ভ হইল, তোমার বুদ্ধির বিকাশের সূচনা হইল। তুমি জ্ঞান নহে, স্বার্থবুদ্ধিরই সমাদর করিতে আরম্ভ করিলে। স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনায় আসল জ্ঞানকে তুমি বনবাসে পাঠাইলে। জ্ঞান অরণ্যে রোদন করিতে লাগিল।

বুদ্ধিরে লইয়া তুমি ঘর করিতে আরম্ভ করিলে। বুদ্ধি তোমার ক্রোড়ে বিজ্ঞান-শিশু প্রদান করিল। তুমি স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইলে ভাবিলে। বিজ্ঞান তোমার গৃহে লালিত পালিত হইয়া ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিল। যুবক বিজ্ঞানের শক্তি সামর্থ্য তেজ ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া তুমি মুগ্ধ হইলে। বিজ্ঞান-জননী বুদ্ধির আদরের সীমা রহিল না। তুমি জ্ঞানের খোঁজ আর রাখিলে না।

বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি

তুমি বুদ্ধির নিকট, যুক্তি-তর্কের নিকট একেবারে আত্মসমর্পণ করিলে; বিজ্ঞানের নিকট একেবারে আত্মবিক্রয় করিলে। বিজ্ঞান

তোমাকে অফুরন্ত ধন দিল, সম্পত্তি দিল, বিলাসিতার উপকরণ দিল। তুমি ধন-সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলে, বিলাসিতায় উন্মত্ত হইলে। বিজ্ঞানের দৌলতে তুমি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্, সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্ হইলে। তুমি রাজরাজ্যেশ্বর হইলে।

বিশ্বজগৎ রাজরাজেশ্বরী বিজ্ঞান-জননী তোমার বুদ্ধির জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। তুমি অহঙ্কারে মত্ত হইলে। তোমার আদেশে জ্ঞান নির্ব্বাসনে আরও কঠোর যাতনা ভোগ করিতে লাগিল।

জ্ঞান সামঞ্জস্য স্থাপন করে, বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে; বুদ্ধি ভেদ সৃষ্টি করে, শান্তির মধ্যে বিরোধ আনয়ন করে।

বুদ্ধির যুগ

(Age of Reason.)

জ্ঞান তোমার ঘরের লক্ষ্মী ছিল; তুমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া চটুলা কলহ-প্রিয়া বুদ্ধিকে বরণ করিলে।

চটুলা বুদ্ধির তুমি সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া বুদ্ধির প্ররোচনায় তুমি প্রচার করিলে, মানুষে মানুষে কোন অনৈক্য নাই। তুমি মুখে খুব সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার নাম কীর্ত্তন করিলে, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রজার রক্তে রঞ্জিত হইয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। হত্যা লুণ্ঠনের পাপকে বরণ করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়া, সমাজকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল,—কারণ সে যে Age of Reason, তখন আবার ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান কোথায়? তাহার পর তুমি বিভিন্ন দেশে যাইয়া সৈন্যবলের দ্বারা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে। জ্ঞানের কথা শুনিলে তুমি কখনই জোর করিয়া কাহাকেও স্বাধীন করিতে যাইতে না। যুদ্ধের দ্বারা সখ্য স্থাপন হয় না, এ সোজা কথাটা তুমি তখন বুঝিলে না।

সে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন আমরা এক অদ্ভুতপূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়াছিলাম। তোমার একজন সেবক স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর

মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জগৎকে বিংশতি যুদ্ধে নিঃক্ষত্রিয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; তিনি প্রজারঞ্জক নেপোলিয়ন। রাজ্য ও রাজা ভাঙ্গিয়া গড়িয়া, ক্ষত্রিয়ের গৌরব চূর্ণ করিয়া তিনি প্রজার সাম্রাজ্য গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন, টাইগার হইতে ডানিউব, রাইন হইতে নীলনদের জল ক্ষত্রিয়-শোণিতে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। মুসলমানের মস্‌জিদ, জার্ম্মাণের বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্যারোয়ার কবর, প্রজাতন্ত্র রিপাব্‌লিকের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইল। ক্ষত্রিয় রাজা হীনবল হইল, একেবারে বিনষ্ট হইল না। ক্ষত্রিয়-রুধির তর্পণের দ্বারা জগতে স্বাধীনতা আসিল না, সাম্য ও মৈত্রী প্রচারিত হইল না, প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান হইল না। তুমি ক্ষত্রিয়-শোণিতে স্নান করিয়া উঠিলে, তোমার সেবক তখন বন্দী, শৃঙ্খলিত; তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া তুমি কাঁদিলে; একবারও ভাবিয়া দেখিলে না স্বাধীনতার নামে, ভাবুকতার নামে, দর্শনের নামে কত বড় একটা মহাপাপ অনুষ্ঠিত হইল, কত রক্তপাত, কত লুণ্ঠন, কত হত্যা হইল। মহনীয় নীতির কি ভীষণ অপব্যবহার হইল, তুমি দেখিয়াও দেখিলে না।

মহনীয় ভাবুকতার অপব্যবহার

কারণ তোমার মতিভ্রম হইয়াছিল। যাহা বুদ্ধির দ্বারা পাওয়া যায় তাহা শঠ ও কৌশলীর হাতে ভীষণ অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারে, ইহা তুমি বুঝিবে কি করিয়া? জ্ঞানের মহিমা যে তখন লুপ্ত। জ্ঞানের খোঁজ কিছু রাখিলে তুমি কখনই আপনার ভাবসম্পদকে শঠ ও কৌশলীর হাতে দিতে না। বুদ্ধি খেলার সামগ্রী হইতে পারে, জ্ঞান যে শ্রদ্ধার সামগ্রী।

সমাজে স্বার্থের সংঘাত

তবুও তুমি সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বুলি আওড়াইতে লাগিলে, তুমি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলে, তোমার প্রজাতন্ত্রে দলাদলির ভাব প্রতিপত্তি লাভ করিল। কোন দল আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত নহে,

সমাজতন্ত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন কাহারও লক্ষ্য নহে। রাষ্ট্রের নিকট হইতে কে কত আদায় করিতে পারে, তাহাই প্রত্যেকের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্র দলাদলির অত্যাচার অতি সহিষ্ণুতার সহিত সহিল,—কারণ এ যে প্রজাতন্ত্র, ব্যক্তি বল বা দল বল কেহ কাহারও অধীন নহে। শুধু রাষ্ট্র সকলের অধীন, সকলের অত্যাচার সহিবে। "Whatever you want belabour the state till you get it" এই হইল প্রজাতন্ত্রের নীতি। রাষ্ট্রকে পীড়ন করা, ভয় দেখান ছাড়া আদায় করিবার আর এক উপায় আছে। সে উপায় আরও হীন। ধনকুবেরগণ, ট্রাষ্ট, সিণ্ডিকেট প্রভৃতি অর্থদ্বারা রাষ্ট্রকে বশীভূত করিবার জন্য আপনাদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে।

তুমি ঐক্যমন্ত্র প্রচার করিয়াছ; কিন্তু সমাজকে অর্থের তারতম্য অনুসারে তুমি বিশিষ্ট জাতিসমূহে বিভক্ত করিয়াছ। একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, আর একদিকে বিলাস উপভোগের দম্ভ—তোমার শান্তি চিরকালের জন্য দূর করিয়াছে।

তুমি যে বুদ্ধির পক্ষপাতী, তাই জ্ঞানকে অনাদর করিয়াছ। বুদ্ধি মুখে বলিবে—আমরা সকলে এক, কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রত্যেকে প্রত্যেককে হটাইতে শিখাইবে। জ্ঞানের নিকটই প্রকৃত ঐক্যের কথা শুনা যাইবে। জ্ঞানকে না পাইলে তুমি কাহাকেও শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে না, ভক্তি করিতে শিখিবে না। মনুষ্যত্বকে শ্রদ্ধা করিতে না শিখিলে ঐক্যভাব অসম্ভব। সে শ্রদ্ধা বুদ্ধি হইতে আসে না, তাহা জ্ঞানের দান। জ্ঞান না হইলে, তোমার সহিত অপর ব্যক্তির, তোমার সহিত রাষ্ট্র ও সমাজের বন্ধন যে কি, তুমি বুঝিবে না; বন্ধনটা যে কৃত্রিম নহে, সে বন্ধনের সহিত যে তোমার নাড়ীর যোগ আছে, ইহা বুঝিবে না। দেখিলে না, তোমাদের স্ত্রীজাতি সামান্য বিদ্যালাভ করিয়াই কি করিয়া বসিয়াছে! তাহারা পুরুষকে সন্দেহ, অবিশ্বাস এমন কি ঘৃণা করিতেছে; এই ঘৃণা করা কাজটা

শিক্ষিত স্ত্রীর একমাত্র কর্ম্ম হইয়াছে। ইহা বুদ্ধির প্ররোচনা। বুদ্ধি ত বিরোধ সৃষ্টি করিবেই। এই যে নব্য-স্ত্রীর ভাব ও আদর্শ, ইহা সম্পূর্ণ সমাজবিরোধী।

এই যে পারিবারিক জীবনের প্রতি অশ্রদ্ধা, ইহা একেবারে সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। স্ত্রী কি শেষ পর্য্যন্ত তোমার হিসাবে পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী better half নহে? বুদ্ধির দৌড় দেখিলে?

স্বার্থবুদ্ধি ও পরার্থ জ্ঞান

বুদ্ধি তোমাকে সমাজের নিকট হইতে শুধু আদায় করিতেই শিখাইবে। জ্ঞান সমাজের সহিত তোমার প্রাণের টান হৃদয়ের যোগ স্থাপন করিয়া তোমাকে সমাজের নিকট আত্মদান করিতে শিখাইবে।

বুদ্ধি বলে, তুমি দল পাকাও, চোখ রাঙ্গাও, দুর্ব্বলকে পীড়ন কর, তোমার দলের স্বার্থসিদ্ধি হইবে, তুমিও কিছু পাইবে। জ্ঞান বলেন, রাষ্ট্র শুধু তোমার আমার নহে, রাষ্ট্র সকলের; যাহারা জীবিত তাহাদের ত বটেই, যাহারা এখন জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহাদেরও। আমরা ডাকাতের দল নহি। আমরা স্বেচ্ছা-সেবকমণ্ডল। "কি লইব" ইহা চিন্তার বিষয় নহে। "কি দিব" ইহাই যে চিন্তা করিতে হইবে। বুদ্ধি বলে, "কি লইব," জ্ঞান বলেন, "কি দিব।" বুদ্ধি স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞান পরার্থের জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। কেন প্রস্তুত, তাহা জ্ঞানই জানেন, তাহা বুদ্ধির ধারণার অতীত।

তুমি বুদ্ধিকে বরণ করিয়াছ, তাই তোমার প্রজাতন্ত্র স্বার্থানুসন্ধিৎসু দলাদলির চীৎকারে অধ্যুষিত, দলাদলির টানাটানিতে বিপর্য্যস্ত ও হীনবল। এ দুর্দ্দিনে সে দলাদলিকে প্রশ্রয় দিয়া কত শক্তির যে অপব্যয় করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া কূল কিনারা পাওয়া যায় না। তোমার সমাজ সাম্য ও মৈত্রীর ধ্বজা উড়াইয়া নিকৃষ্টতম অনৈক্যের প্রশ্রয় দিয়াছে এবং অসংখ্য নরনারীর

মনুষ্যত্বকে নিপীড়িত করিয়াছে। তুমি বুদ্ধিকে বরণ করিয়াছ, তাই তোমার ব্যবসাক্ষেত্রে ধন ও শ্রমশক্তির স্বার্থের সংঘর্ষ ক্রমশঃ তুমুল হইয়া উঠিয়াছে। ধনীসমাজ শ্রমজীবীসমাজকে বিশ্বাস করে না; শ্রমজীবী অবিশ্বাসী হইয়াছে, ধনী বিশ্বাসঘাতক হইয়াছে।

তোমার সাহিত্য সমাজের দোষ খুঁজিয়া বেড়ায়,—দোষ সংশোধন করিবার জন্য নহে, তাহাকে হাস্যাস্পদ করিবার জন্য, মানুষকে অন্যের নিকট হেয় করিবার জন্য, সমাজকে নিজেরই নিকট ঘৃণিত করিবার জন্য। তোমার ধর্ম্ম যে ধর্ম্মের ভাণ মাত্র হইয়াছে। তোমার নীতি, তোমার দর্শন আজ কাল দেখিতেছি স্বার্থসিদ্ধিকে একমাত্র অবলম্বন করিয়া ধরিয়াছে।

তুমি ভাবিয়াছ, বুদ্ধি যে এই বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে, সে শান্তিরও একটা ব্যবস্থা করিতে পারিবে; বুদ্ধি যে স্বার্থকে সজাগ ও সচেষ্ট রাখিয়াছে, সেই স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে সমাজকে রক্ষা করিতে পারিবে। বুদ্ধি যে সাহিত্যকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়াছে; বুদ্ধি যে প্রজাতন্ত্রকে দুর্ব্বল, সমাজকে বিপর্য্যস্ত, উপরন্তু বুদ্ধি যে ব্যবসায়কে হানাহানি, ধর্ম্মকে অধর্ম্ম, নীতি ও দর্শনকে শঠতায় পরিণত করিয়াছে, তুমি ভাবিয়াছ সে বুদ্ধি আবার আপনিই মুক্তির পথ খুঁজিয়া বাহির করিবে। সেই সমাজ-জীবন রক্ষা করিবে।

বুদ্ধির দ্বারা কৌশলের দ্বারা কল চলে, কল তৈয়ারী হয়, কল নষ্টও হয়। জীবন ত কল নহে; জীবনে কল তৈয়ারী হয় না। সমাজ-জীবনে প্রাণ চাই। সে প্রাণ হইতেছে জ্ঞান। সে প্রাণ হইতেছে, মানুষের হৃদয়। মানুষের হৃদয়ের যোগ, প্রাণের টান, না থাকিলে সমাজ-জীবন রক্ষা পাইবে না। সে যোগ, সে টান জ্ঞান হইতে আসে। বুদ্ধি সে প্রাণ, সে হৃদয় দিতে পারে না। বুদ্ধি স্বার্থ তৈয়ারী করে, স্বার্থসিদ্ধির কল-কারখানা ও বিপুল আয়োজনের সৃষ্টি করে। বুদ্ধি জীবন্ত কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না। বুদ্ধি সমাজের জীবনীশক্তি প্রদান করিতে পারে না।

জ্ঞান ও সমাজ

জ্ঞান ব্যক্তির সহিত সমাজের প্রাণের টান ধরাইয়া দেয়, জ্ঞানই সমাজকে জীবনী-শক্তি প্রদান করে। জ্ঞান সমাজকে হৃদয় দেয়, প্রাণ দেয়, সমাজকে জীবন্ত করে। বুদ্ধি বলে, সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি ; জ্ঞান বলে, সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি বটে, কিন্তু ব্যক্তির মত সমাজেরও একটা প্রাণ আছে, জীবন আছে। সে জীবনের কাছে ব্যক্তিগত জীবন নিতান্ত হেয়, তুচ্ছ। সমাজ উপভোগ্য নহে, সমাজ ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে। সমাজেরও অনুভূতি আছে, সমাজের আত্মা আছে। সমাজ-আত্মা সমাজ-জীবন হইতেই ব্যক্তি তাহার স্বার্থানুসন্ধিৎসা, তাহার প্রাণ, তাহার জীবন লাভ করে। ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধে কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নাই। ব্যক্তি আপনাকে সমাজজীবনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবে, যতই সে সমাজ-জীবনের লক্ষ্যের সহিত আপনার লক্ষের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিবে, ততই তাহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, ততই সে পূর্ণতর জীবন লাভ করিবে। তাহার জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত ক্ষুদ্র স্বার্থ, তাহার ব্যক্তিগত জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা সমস্তই এক পুণ্য সমাজ-জীবন-নদের অতল জলে নিবিড় আনন্দে তলাইয়া যাইবে। এ স্বার্থ বিসর্জ্জনে আনন্দ আছে, উৎসাহ আছে, উত্তেজনা আছে—সে আনন্দ ও উৎসাহ স্বার্থসিদ্ধি হইতে আসে না। ভক্তি ও শ্রদ্ধা সে আনন্দ সৃষ্টি করে। ব্যক্তির জীবনস্রোত সমাজের পুণ্যপ্রবাহে জীবন হারাইলে, ব্যক্তি একটা নিত্য বিমল ও পূর্ণ জীবন ফিরিয়া পাইবে। সমাজের পূত মন্দাকিনীধারার কল্লোলধ্বনির সহিত আপনার জীবনস্রোতের সুর মিলাইয়া ব্যক্তি আপনাকে সেই বিশ্বমানবের মহাসাগরসঙ্গমতীর্থে লইয়া যাইবে। সেখানে তাহার কর্ণে যে উত্তাল-তরঙ্গমালার মহাসঙ্গীত গীত হইবে, তাহাই তাহার চরম শান্তি ও পরম আনন্দ, তাহাই তাহার সার্থক জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা।

ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা

বুদ্ধি স্বার্থানুসন্ধিৎসার উৎসাহ প্রদান করিয়া সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। প্রত্যেক শ্রেণী আপনার বিশিষ্ট স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিপুল প্রয়াস করিয়াছে, সমাজে তুমুল বিপ্লব আনিয়াছে। ক্ষুদ্র স্বার্থের প্ররোচনায় ব্যক্তি ও শ্রেণী সমাজজীবনস্রোত হইতে দূরে আসিয়া কূপ-মধ্যে আপনার সঙ্কীর্ণ জীবনকে হীনবল করিয়াছে। সমাজজীবনও ক্রমশঃ হীনবল হইয়াছে।

ব্যক্তির স্বার্থ-বিসর্জ্জনে পূর্ণতর জীবন লাভ না করিয়া তাহার স্বার্থ-প্রতিষ্ঠায় সমাজ ক্রমশঃ নির্জীব ও রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। ভিতরে দ্বন্দ্ব, বাহিরেও দ্বন্দ্ব, অন্তর বাহিরে স্বার্থের প্রচণ্ড ঘাত প্রতিঘাত। বিভিন্ন সমাজ জাতিপ্রেমের নাম ধরিয়া আপনাদের স্বার্থসাধনের জন্য তুমুল যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে। বিভিন্ন জাতি জ্ঞানের নাম ধরিয়া আপনাদের স্বার্থ-সাধনের জন্য প্রচণ্ড বাহুবলে যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরকে আহ্বান করিয়াছে। নেপোলিয়নের যুগের মত আবার মহনীয় নীতি ও আদর্শ শঠ ও কৌশলী বুদ্ধির চালনায় নিকৃষ্ট স্বার্থসাধনার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইল। সমাজের অভ্যন্তরে স্বার্থের প্রচণ্ড সংঘাত, বাহিরে বিভিন্ন সমাজের স্বার্থের প্রচণ্ডতর সংঘাত। স্বার্থসিদ্ধির এই প্রচণ্ড অভিযানের মধ্যে বিভিন্ন সমাজের লেখক, কবি, দার্শনিকগণ চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, ধন, জন, জীবন আমরা পরার্থে বিসর্জ্জন করিলাম, জগতের কল্যাণের জন্য—আমরা প্রাণ বলি দিলাম। সকলেই সমাজকে শ্মশানে পরিণত করিয়া বিশ্বের হিতসাধন করিতেছেন। জন সমাজের অস্ফুট প্রতিবাদ তাঁহারা তোপে উড়াইয়া দিলেন। জনসমাজের মুখপাত্র প্রজাতন্ত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রজার মতামত একবার ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিল না; যুদ্ধ ব্যাপারটা বুঝা বড়ই কঠিন, তাই রাজা, রাজ-সচিব, সেনাপতি, ইঁহারাই যুদ্ধ সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিয়া সব স্থির করিলেন। প্রজাতন্ত্রের প্রজাগণ মূঢ়, তাহারা

অশিক্ষিত অপরিণামদর্শী মূক রহিল। কিন্তু যখন যুদ্ধের আহ্বান শুনা গেল, তখন ইহারাই আবার বিজয়গান করিতে করিতে রণসাগরে ঝাঁপ দিল। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোক রণক্ষেত্রে উন্মাদের মত প্রচণ্ড আবেগে পরস্পরকে হত্যা করিতেছে,—কত মরিতেছে, তাহার ত ইয়ত্তা নাই।

Few few shall part
Where many meet
And the snow shall be their winding sheet.

নেপোলিয়নের সময়কার যুদ্ধ সম্বন্ধে কবি গাহিয়াছিলেন। আবার সেই হিমতুষারের মধ্যে ভীষণ রক্তারক্তি, মৃত্যুর বিভীষিকা! আবার,

Every turf beneath their feet
Is a soldier's sephulchre.

এ বিভীষিকা আরও করাল। এবার একটা প্রকাণ্ড মহাদেশ রণরঙ্গে মাতাল হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তাক্তকলেবর হইতেছে। একটা প্রকাণ্ড মহাদেশের অগণ্য মাতা, স্ত্রী, ভগিনীর হাহাকার আর্ত্তনাদ বন্দুক কামানের গর্জ্জন ভেদ করিয়া আকাশমার্গে উঠিয়াছে। এ বিভীষিকা আরও মর্ম্মস্পর্শী। একটা বিরাট সভ্যতা স্বার্থের কুবুদ্ধি কুপ্রবৃত্তির প্রচণ্ড তাড়নায় আপনারই শাণিত তরবারি দ্বারা আপনার বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছে। এ বিভীষিকা অত্যন্ত অদ্ভুত। এ ছিন্নমস্তার বিভীষিকা।

বিভীষিকায় অভয়লাভ

একটা মহিমান্বিত সভ্যতা আপনার সমস্ত বেশভূষা, অলঙ্কার, সমস্ত শ্রী ও সৌন্দর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া নগ্না, কুৎসিতা হইয়া হস্তস্থিত খড়্গের দ্বারা আপনাকে হত্যা করিল এবং আপনার রুধির আপনি পান করিয়া নিজ বিপরীত বুদ্ধি ডাকিনী যোগিনীকে তপ্তরুধিরধারায় তৃপ্ত করিতে লাগিল। উন্মাদিনী

ডাকিনী যোগিনীকে সঙ্গে লইয়া, অগণ্য নরনারীকে পদদলিত করিয়া উদ্দাম আবেগে সন্তানের বক্ষে নাচিতে লাগিল।

বিশ্বমানব, তুমি ছিন্নমস্তার এই বিভীষিকা দেখিয়া ভয় পাইও না। এ যে নারায়ণী লীলা। তুমি যাঁহাকে এখন ছিন্নমস্তা দেখিতেছ, তিনিই আবার ভুবনেশ্বরী হইয়া তোমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া অভয়াশীর্ব্বাদ দিবেন।

বর্ত্তমান সভ্যতা, তুমি আত্মঘাতী হইলে, তাহাতে অনুশোচনা করিও না। তোমার আত্মহত্যায় পাপ নাই।

বিশ্বমানবের রঙ্গমঞ্চে এই দৃশ্যই ত অভিনীত হয়। অভিনেতার মত কত সভ্যতা আসে যায়, কত খেলা দেখায়, আবার নূতন সভ্যতাকে রঙ্গমঞ্চে আমন্ত্রণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বিদায় লয়। তোমাদের ধর্ম্ম যে প্রজাপতির ধর্ম্ম। ডিম্বে সন্তানের পুষ্টিবিধানের জন্য তোমরা আপনাদিগকে বলিপ্রদান কর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই ডিম্ব ;—নূতন সভ্যতা সেই সন্তান।

যুগে যুগে সভ্যতার জন্ম ও মৃত্যু বিশ্বমানব নিরীক্ষণ করিতেছে। সভ্যতার মৃত্যু যন্ত্রণায় আমরা কাতর হই, মানুষ কাতর হয় ; কিন্তু সভ্যতার পক্ষে তাহা মৃত্যুযন্ত্রণা নহে, জীবনসঞ্চারের নিবিড় আনন্দ। বিশ্বমানবের পক্ষে তাহা নারায়ণের নিষ্ঠুর লীলা নহে, উহার মুক্তির জন্য তাঁহার অমোঘ বিধান।

হিন্দু ও পাশ্চাত্য সভ্যতার শক্তি ও সাধনা

বর্ত্তমান সভ্যতার প্রায়শ্চিত্ত

আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতায় ব্যক্তির সহিত সমষ্টির সম্বন্ধের আলোচনা করিয়াছি। আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে মোটামুটি বলা যায় যে সমষ্টির কোন সত্তা নাই, সমষ্টির ধারণা হয়, ব্যক্তির ধারণা হইতে। ব্যক্তির বিশেষত্বকে ত্যাগ করিয়া কেবল তাহার ধর্ম্ম লক্ষ্য করিলেই সমষ্টির জ্ঞান পাওয়া যাইবে, ইহাই আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের প্রায় মূলমন্ত্র দাঁড়াইয়াছে।

এই যে ধারণা যাহা এক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত ইহার মূল কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন। ইংরাজ দার্শনিক হবস্ যে এ ভাবের একজন প্রধান পরিপোষক তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এক কথায় ইহা বলিতে পারা যায় যে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব ইউরোপীয় চিন্তা-জগতে যে আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিল তাহা হইতেই এ ধারণার বিশেষ পুষ্টি সাধন হইয়াছিল। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব ব্যক্তির বিশেষত্ববাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দার্শনিক রুসো সমাজ ও সভ্যতা,—সমষ্টির প্রতি এতই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে তিনি অকুণ্ঠিতভাবে বলিতে পারিয়াছিলেন, মানুষ দেবস্বভাব ছিল, সমাজ ও সভ্যতা তাহার পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল বাঁধিয়াছে, তাহাকে শঠ, জাল-জুয়াচোর করিয়া তুলিয়াছে, সমাজদেবকে বাঁদরে পরিণত করিয়াছে। তবুও রুসো সমাজের নিয়ম, সমষ্টির বিধিব্যবস্থাকে উপেক্ষা করিতে পারেন

নাই। ব্যক্তির বিশেষত্ববাদের উপর সমষ্টির নিয়মকানুনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া রুসো নিজ মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। সমষ্টির নিয়মকে তিনি General Will আখ্যা দিয়াছেন কখনও তিনি ইহাকে অসংখ্য ব্যক্তির মতের যোগফল বলিয়াছেন, summation of individual wills, আবার কখনও ব্যক্তির বিশেষত্ববাদকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি সমষ্টির এক অলঙ্ঘনীয় নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছেন। দার্শনিকদিগের মধ্যে রুসোর মত কেহই আপনার মত অমন করিয়া খণ্ডন করেন নাই।

ব্যক্তির বিশেষত্ববাদের আরও এক দিক হইতে পুষ্টিসাধন হইয়াছিল। ইংরাজ হিতসাধনবাদী দার্শনিকগণ (Utilitarians) ব্যক্তির বিশেষত্ব ভাবকে খুব বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহারা The greatest happiness of the greatest number, অর্থাৎ সর্ব্বাধিক ব্যক্তি সমুদয়ের সর্ব্বাধিক হিত সাধনকে যে সমষ্টির নিয়মের আদর্শ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা কি দেখি! সেই একই প্রকার বহু ব্যক্তির একীকরণ দেখিতে পাই। দার্শনিক রুসোর নিকট যাহা বহু ব্যক্তির **মতের** যোগফল হইয়াছিল, তাহাই হিত-সাধনবাদীদের নিকট বহু ব্যক্তির **সুখের** যোগফল দাঁড়াইল।

উভয়ের সাদৃশ্য এইখানে, যে উভয়ই ব্যক্তি গণনা হইতে সমষ্টির ধারণার উপস্থিত হইয়াছিল: উভয়ই ব্যক্তির বিশেষত্ববাদ হইতে সামান্য ধর্ম্মে উপস্থিত হইয়াছিল। উভয় দর্শনই individualistic, উভয়ই arithmetical mechanical, গণনা মূলক, অবৈজ্ঞানিক একীকরণ মূলক।

এই যে গণনামূলক দর্শনবাদ ইউরোপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল তাহার বিষময় ফল সম্বন্ধে, আমি পূর্ব্বে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। এই বিশেষত্ববাদ, ফরাসী দার্শনিক রুসোরই হউক বা হিত সাধনবাদী ইংরাজ দার্শনিকের হউক, ইহা ইউরোপীয় সমাজে সামান্যের ধর্ম্মকে খর্ব্ব করিয়া,

সমষ্টির আদর্শকে খর্ব্ব করিয়া যে আপনার পদে আপনি কুঠারাঘাত করিয়াছে ইহা এখন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এই ব্যক্তির বিশেষত্ববাদের প্রতিষ্ঠার ফলে ইউরোপে কি হইয়াছে তাহা আবার বলিব? এক্ষেত্রে পুনরুক্তিতে দোষ নাই, কারণ এখনও আমরা ইউরোপীয় ব্যক্তির বিশেষত্বভাবের মহিমায় মুগ্ধ, উন্মত্ত রহিয়াছি। ব্যক্তির বিশেষত্ববাদ ইউরোপের রাষ্ট্রকে দলাদলির রেষারেষির তাণ্ডবনৃত্যের ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে, সমাজকে ধনী ও নির্ধন, শ্রমজীবী ও ব্যবসায়ীদিগের তুমুল দ্বন্দ্বের লীলাভূমিতে পরিণত করিয়াছে। ব্যক্তির বিশেষত্ব এমন সমষ্টির নিয়মকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব স্ফুরণ এখন ব্যক্তির ধর্ম্ম হইয়াছে। এখন বিশ্লেষণ নীতিরই প্রতিপত্তি, সামান্যের ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায়।

বিশ্লেষণ নীতির প্রভাবে বুদ্ধির নাম হইয়াছে জ্ঞান, চালাকির নাম হইয়াছে শক্তি, উদ্ভট কল্পনার নাম হইয়াছে ভাবুকতা। সাহিত্য, আর্ট, ধর্ম্ম,—যাহাদের প্রাণ হইতেছে সামান্য ধর্ম্ম, তাহারা পর্য্যন্ত এখন বিশেষত্বের পক্ষপাতী, আবার তাহাদেরই নাম হইয়াছে mysticism। সমাজে এখন বিপ্লবের নাম হইয়াছে বিশেষত্ব-রক্ষা, Carsonism হইয়াছে দেশ ভক্তি, Larkinism হইয়াছে সমাজ সেবা। সমাজ এখন হয় anarchism, ব্যক্তি-তন্ত্র না হয় Communism সাধারণ তন্ত্রের আদর্শের পুষ্টিসাধন করিয়া আত্মঘাতী হইতেছে।

সমাজের ভিতর যেমন ব্যক্তি পরস্পরকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেছে; প্রত্যেকেই যেমন অপরকে সমাজ সেবকভাবে না দেখিয়া স্বার্থানুসন্ধিৎসুরূপে দেখিতেছে বাহিরেও সেরূপ জাতিতে জাতিতে ঘোরতর অবিশ্বাস, বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ। সমগ্র ইউরোপীয় সভ্যতাই এতদিন এই অনিশ্চিততা ও সন্দেহের মধ্যে ছিল। ইউরোপীয় ভাব-সম্পদ, ইউরোপীয় সাহিত্য-চিত্রকলা দর্শন নীতি, এমন কি ইউরোপীয় ব্যবসায়েরও বিকাশ ও উন্নতি সাধনের পক্ষে এই অবিশ্বাস ও বিশ্বাসঘাতকতার যুগ

বিশেষ অন্তরায় হইয়াছিল। তাহার পর এই অবিশ্বাস ও বিশ্বাসঘাতকতাকে অপ্রত্যাশিতভাবে অতিক্রম করিয়া ইউরোপীয় সভ্যজগতে যুদ্ধ বাধিল।

যেখানে সমষ্টির নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, সেখানে ব্যক্তির বিশেষত্বকেও বিশ্বাস নাই। যে চিন্তা ধারার ফলে প্রত্যেক সমাজেই ব্যক্তির বিশেষত্ববাদ হইতে anarchism, ব্যক্তি-তন্ত্রের পুষ্টিসাধন হইয়াছে, সেই চিন্তাধারাই অন্তর্জ্জাতীয় ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা, শত্রুতা সাধন, জাতি-বৈরী, অন্তর্জ্জাতীয় নিয়মের (international law) অবজ্ঞাকে সৃষ্টি করিয়াছে।

আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা ব্যক্তির বিশেষত্ববাদের সৃষ্টি করিয়াছে। ব্যক্তির বিশেষত্ববাদের নিকট ইউরোপীয় সভ্যতা আপনাকে এখন বলি-প্রদান করিল।

বিশেষ ও সমষ্টি

সকলকে এখন এ কথা এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব যাহা হইতেই ব্যক্তির বিশেষত্ববাদের সমষ্টি তাহা ইউরোপীয় সভ্যতাকে বিপথে প্রেরণ করিয়াছে। উন্মার্গগামী ইউরোপীয় সভ্যতা এখন আপনারই রক্তে তর্পণ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।

ব্যক্তির বিশেষত্ববাদকে ইউরোপীয় সমাজ-দর্শন প্রতিষ্ঠা করিবার সময়েও একটু ভয় পাইয়াছিল, একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিল। প্রথম হব্‌সের কথাই ধরা যাউক। ব্যক্তি আপনার বিশেষত্ব সমর্পণ করিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিল, ব্যক্তি যে স্বাধীন জীবনের স্ফূর্ত্তি অনুভব করিত তাহাকে খর্ব্ব করিয়াই রাষ্ট্রের জীবন দান করিল, ইহা হব্‌স্‌ বলিয়াছেন; কিন্তু হব্‌স্‌ ইহাও আবার বলিয়াছেন, বহু ব্যক্তির স্বাভাবিক স্বত্বের (Natural Rights) বিয়োগ ফলেই যে রাষ্ট্র তাহা শুধু নহে। শুধু মতামতের গণনা হইতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি নহে। হব্‌স্‌ বহু ব্যক্তির মতের একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের কথাও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন "This is more

than consont or concord"—রাষ্ট্রের উৎপত্তি শুধু মত গণনা, মতের যোগফলে নহে, "it is a real unity of them all in one and the same person. রাষ্ট্রের সৃষ্টি ব্যক্তির মতামতের সামঞ্জস্য স্থাপনে, অতএব রাষ্ট্র অথবা সমষ্টির মধ্যেও ব্যক্তি যে আপনার ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখিবে, ইহা হব্‌স ইঙ্গিত করিলেও, তাঁহার দর্শন বাস্তবিক পক্ষে ব্যক্তির বিশেষত্ববাদকেই মুখ্যভাবে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিল। বেনথাম, মিল ও স্পেন্সার, যাঁহারাও ব্যক্তির বিশেষত্ববাদের পরিপোষক, তাঁহাদের মতে সমাজ বিধি, আইনকানুন ব্যক্তির স্বাধীনতাকে থর্ব্ব করে, কিন্তু তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন, আইন বিধিকে আপদ্ধর্ম্মের মত মানিতেই হইবে। আইন না থাকিলেই ভাল; কিন্তু অরাজকের অমঙ্গল অপেক্ষা আইন মানার কষ্ট অপেক্ষাকৃত ভাল। রোগীর পক্ষে ঔষধের মত সমাজকে তিক্ত আইনকেও গলাধঃকরণ করিতে হইবে। বেনথামের ভাষায় It is with Government as with medicine; its only business is the choice of evils. Every law is an evil, for every law is an infraction of liberty ইহাদের মতে সমষ্টি ব্যক্তির বিপক্ষাচরণ করে। স্পেন্সার বলিয়াছেন, রাষ্ট্রব্যক্তির প্রতিদ্বন্দী,—the man versus the state ইঁহারা সকলেই বলেন, আইন ব্যক্তির বিশেষত্বকে বিকাশলাভ করিতে দেয় না; কিন্তু তাই বলিয়া ইহারা কেহই আইন জানিতে পরাঙ্মুখ নহেন। এইখানেই আমরা ব্যক্তির বিশেষত্ববাদের পক্ষপূর্ণতা দেখিতে পাই।

রুসোর সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি; তিনি ব্যক্তির বিশেষত্ববাদের প্রধান পরিপোষক হইয়াও সমষ্টির অলঙ্ঘনীয় নিয়মের প্রভাবের কথাও বলিয়াছিলেন; বাস্তবিক রুসোর সমষ্টির জ্ঞান তাঁহার দর্শনের একটা অসামঞ্জস্য, একটা inconsistency,—ইহা অনেকেই বলিয়াছেন। আমিও এই মতের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ডাক্তার বোসানকোয়েট

অপরদিকে বলিয়াছেন, রুসোর দর্শনে সমষ্টির মত বহু ব্যক্তির মতের একটা যোগফল নহে। ব্যক্তির মতামত অপূর্ণ, সীমাবদ্ধ, অজ্ঞানজড়িত। সমষ্টির মত the General will পূর্ণ অজ্ঞানাতীত "The general will is inalienable, indivisible, and incorruptible" রুসো বলিয়াছেন। সমষ্টির মতই সত্য; ব্যক্তির মত অসত্য। প্রত্যেক ব্যক্তিতে ব্যক্তিত্ব আছে, সমষ্টিত্ব আছে। এজন্য প্রত্যেক ব্যক্তি একই সঙ্গে রাজাও প্রজা, "at once subject and sovereign". যখন তাহার ভিতরে সমষ্টিত্বের অনুভূতি রহিয়াছে তখন সে রাজা বিচারকর্ত্তা,—তখন ব্যক্তিগত মতের সহিত সমষ্টি মতের কোন ভেদাভেদ নাই, যখন সে অজ্ঞানান্ধ, যখন সমষ্টির ছাপ তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইতেছে না, তখন সে প্রজা এবং তখন নিজ রাজার নিকট সে নিজেই বিচার ও দণ্ডপ্রার্থী।

যাহাই হউক বোসানকোয়েটের হাতে রুসোর theory of the general will ব্যক্তির বিশেষত্ববাদকে মানিয়া, তাহার উপর উঠিয়া সমষ্টিত্বভাবকে প্রকৃত সত্য বলিয়া বরণ করিয়াছে।

বোসানকোয়েট হেগলের শিষ্য। তাই হেগেলের চিন্তাধারার দ্বারা বোসানকোয়েট বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাই রুসোর মধ্যেও তিনি সমষ্টির জ্ঞানকে খুঁজিয়াছিলেন।

জার্ম্মাণীতে সমষ্টিবাদ

ভাবুক প্রবর হেগেলের বিশ্বদর্শনে যে ভাবে বিশেষ ও বিশ্ব, ব্যক্তি ও সমষ্টির সমস্যার সাধন হইয়াছিল তাহা ইউরোপীয় চিন্তাজগতে একটা নূতন স্রোত আনিয়াছিল। হেগেলের মতে সমষ্টিত্বই ব্যক্তিত্বের মূল। সমষ্টি অনন্ত, পূর্ণ, মায়াতীত, তাহা হইতেই ব্যক্তির বিকাশ, আবার তাহাতেই ব্যক্তিত্বের লয়। ব্যক্তিমানব যতই সমষ্টি মানবত্বের সত্বায় আপনার সত্বা অনুভব করিবে, ততই তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশ ততই

দেশকাল সীমা লঙ্ঘন করিয়া সে এক পূর্ণ অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হইবে। তাহাই ব্যক্তি মানবের সাধনা, "The individual's particular satisfactions, activities and ways of life have in this substantive authenticated principle their origin and result. ভূমাই জ্ঞান, ভূমাই মুক্তি, ভূমাই আনন্দ, ইহাই হেগেলের বাণী।

লর্ড হ্যালডেন বলিয়াছেন, হেগেলের দর্শন প্রচারের ফলে রাষ্ট্রের সত্ত্বায় আপনার চৈতন্যকে বিলীন করা ব্যক্তি মানবের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছিল, রাষ্ট্রের বন্ধনকে ব্যক্তি আপনার মুক্তি সাধনার উপায় বলিয়া বরণ করিয়াছিল। রাষ্ট্রই দেবতা, the state is God. সমগ্র জার্ম্মাণ সমাজ সিংহাসনে, রাষ্ট্রদেবতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্যক্তি-হৃদয়ের পূজা পাইতে লাগিল।

আমি বারান্তরে আলোচনা করিয়াছি, হেগেলের চিন্তাধারা অধিককাল জার্ম্মাণ সমাজে প্রবাহিত হইতে পারে নাই। নানাদিক হইতে হেগেলের ভাবুকতার প্রতিরোধ হইল। Back to Kant, কাণ্টের দিকে ফের, ইহাই জার্ম্মাণ দর্শনের মূলসূত্র হইল। ফিউরক, করালমার্কস্, এঞ্জেলস্ প্রভৃতি জার্ম্মাণ চিন্তাকে ভূমা হইতে সীমার গহন বনে আনিয়া পৌঁছাইলেন।

তবুও হেগেলের চিন্তা জার্ম্মাণীর রাষ্ট্র ও সমাজগঠন প্রণালীকে নিবিড়ভাবে পূর্ণ করিয়াছিল। জার্ম্মাণ জাতীয় জীবনে যাহা কিছু মহৎ তাহারই মূলে হেগেলের এই ভাব।

কিন্তু এখন দেখিতেছি, জার্ম্মাণীর সমাজ ও রাষ্ট্রে সমষ্টিত্বভাব ব্যক্তিত্বকে পুষ্ট হইতে দিতেছে না। হেগেল যখন বলিয়াছেন, ব্যক্তিমানব সমষ্টি মানবের ভিতর আপনার চৈতন্তের ছাপ অঙ্কিত দেখিয়া আপনার সংকীর্ণভাব ও কর্ম্মকে ("particular satisfactions and

activities") বিসর্জ্জন দিবে, তখন তিনি জ্ঞান রাজ্যের কথা বলিয়াছিলেন জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিমানব সমষ্টি মানবের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে। বাস্তবরাজ্যে কিন্তু আর এক প্রকার দাঁড়াইল। সমষ্টি ব্যক্তির জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশ সাধনের অন্তরায় হইল।

হেগেল একস্থলে বলিয়াছিলেন, "One can see in the first village of Prussian territory one enters the *lifeless* and *wooden routine* which prevails." সমগ্র জার্ম্মাণ সমাজ সম্বন্ধে এখন এই কথাই খাটে, সমষ্টি এখন ব্যক্তিত্ব বিকাশ প্রতিরোধ করিতেছে। Prussian bureaucracy এখন একটা প্রকাণ্ড ভারী রোলালের মত সমাজের উপর চাপিয়া সকল লোকের ব্যক্তিত্বকে পিসিয়া ফেলিয়াছে, ভাবিতেছে ব্যক্তির বিশেষত্বের উচু নীচু সমান না করিয়াদিলে, রাষ্ট্রসৌধ একটা সমতলভূমি না পাইলে, তাহার গোড়া পত্তনে একটা গলদ থাকিয়া যাইবে।

ব্যক্তির সহিত সমষ্টির বিরোধ

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব প্রসূত ব্যক্তির বিশেষত্ববাদের পরিণাম হইয়াছে,— এক কথায় যদি বলি,—ব্যক্তির সহিত সমষ্টির বিরোধ স্থাপন, ব্যক্তিবাদের (individualism) সহিত সমষ্টি বাদের অসামাঞ্জস্য। জার্ম্মাণীতে হেগেল ফরাসীবিপ্লব-প্রসূত চিন্তার গতিরোধ করিয়াছিলেন। হেগেল প্রমুখ-জার্ম্মাণ দার্শনিক গণের সমষ্টিত্ববাদের পরিণাম হইয়াছে,- সমষ্টির সহিত ব্যক্তির বিরোধ স্থাপন সমষ্টিবাদের সহিত ব্যক্তিবাদের অসামাঞ্জস্য। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে দেখিতেছি, সমষ্টির উপর ব্যক্তির অত্যাচার, কতভাবে তাহা এই দুইদেশে দেখা গিয়াছে,—"Carsonism," "Larkirvism," "Syndicalism," "Woman Suffrage," "Declining Marriage rate,"

আর কত নাম করিব। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে এক হিসাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার একটা বিশেষ চিন্তাধারার পরিণতি, শেষ পরিণাম দেখিতে পাই। জর্ম্মাণীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার অপর চিন্তা ধারাটির শেষ পরিণাম। জার্ম্মাণীতে দেখিতেছি, ব্যক্তির উপর সমষ্টির অত্যাচার,—তাহাই বা কতরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, "Kaiserism," Militarism," "Bureaucracy," "state socialism," "Macchiavellism," "Necessity has no law." ইংরাজ-ফরাসী সভ্যতা ও জার্ম্মাণ সভ্যতা, দুইয়ের মূলমন্ত্র বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী। প্রকাণ্ড সংগ্রামে এই বিরোধের এক্ষণে পরীক্ষা হইতেছে; যুদ্ধক্ষেত্রে এ বিরোধের মিমাংসা হইবে কিনা তাহা সন্দেহ। উভয় সভ্যতা, —ইংরাজ ফরাসী জার্ম্মাণ সভ্যতার এইখানে বৈষম্য নাই, যে উভয়ই ব্যক্তি ও সমষ্টির বিরোধে আক্রান্ত, এই অভ্যান্তরীন বিরোধের কেহই মিমাংসা করিতে পারে নাই। ব্যক্তির সহিত সমষ্টির তুমুল বিরোধ, জার্ম্মাণীতে আমরা দেখি এবং ইংলণ্ডেও ফ্রান্সে দেখি ইহাই পাশ্চাত্য সভ্যতার শেষ কথা the last word of European civilisation। পাশ্চাত্য সভ্যতার জীবন মরণের সংগ্রাম এই বিরোধকেই লইয়া। পাশ্চাত্য সভ্যতার আভ্যন্তরীন-বিরোধের কথা লইয়া আলোচনা করিলাম। এ বিরোধ এমন একটা তত্ত্বকে লইয়া যে ঐ তত্ত্বের মিমাংসা না হইলে ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবন দুইয়েরই পক্ষে স্ফূর্ত্তি লাভ অসম্ভব।

এইবার পাশ্চত্য দার্শনিকও সমাজ তত্ত্ববিদের তর্কের কচকচি ছাড়িয়া আমাদের হিন্দু সভ্যতার আদর্শের সম্মুখীন হওয়া যাউক।

হিন্দুচিন্তায় ব্যক্তি ও সমষ্টির একত্বানুভূতি

ব্যক্তির সহিত সমষ্টির সম্বন্ধ হিন্দু সভ্যতা কি ভাবে দেখিয়াছেন? ব্যক্তি সত্য, না সমষ্টি সত্য, হিন্দু সভ্যতা এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন? ব্যক্তি পূর্ণ, না সমষ্টি পূর্ণ, ব্যক্তির ধারণা আগে না সমষ্টির ধারণা আগে, এ সকল তত্ত্বের হিন্দু সভ্যতা কি ভাবে মিমাংসা করিয়াছেন?

এ সকল প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হইবে? প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেই তখনই কি ইহাদের উত্তর আমাদের হৃদয়ে স্বতঃই উদয় হয় না? না হয় না, কারণ আমরা এতকাল ইউরোপকে ভাল বলিয়া জানিয়াছি, এবং ইউরোপের দিক হইতেই আমাদের সমাজের ভাল মন্দ বিচার করিতেছি। স্রোত এখন যে ফিরিয়াছে তাহা ঠিক, হিন্দু সভ্যতা যে হিন্দুসভ্যতাই, তাহার মাপকাঠি হিন্দুসভ্যতায় পাওয়া যাইবে, ইউরোপীয় সভ্যতায় নহে, তাহা এক্ষণে আমরা বুঝিতেছি। বিশেষতঃ এখন যখন, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আমরা ভদ্রবেশ খুলিয়া অসভ্য নগ্নমূর্ত্তিতে দেখিতেছি, তখন আমরা সভ্যতার আদর্শ খুঁজিবার জন্য যে আবার পশ্চিম মুখো কখনও হইব তাহা বিশ্বাস হয় না।

হিন্দু সভ্যতাই হিন্দু সভ্যতাকে বিচার করিবেন। হিন্দুর আদর্শ, ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্বন্ধ কি? ইউরোপীয়ের কথা ছাড়িয়াদি, হিন্দু এ সম্বন্ধে কি বলেন? ব্যক্তির সহিত সমষ্টির সম্বন্ধে হিন্দু এক কথায় বলিবে সমষ্টিই সত্য, পূর্ণ, কিন্তু তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা ব্যক্তির ভিতরই। হিন্দু এরূপে ব্যক্তিও সমষ্টির একত্ব অনুভব করিয়াছে এবং এই একত্বানুভূতির ফলে হিন্দু ব্যক্তি ও সমষ্টির বিরোধ হইতে দেয় নাই।

সর্ব্বভূতে আমি, আমাতে সর্ব্বভূত

সমষ্টি পরমজ্ঞান ও আনন্দময়, আবার সমষ্টির পরিপূর্ণ জ্ঞান ও আনন্দের প্রতিষ্ঠা ব্যক্তিতে, আত্মায়। ব্যক্তি বলিলে, হিন্দু শুধু মানুষ বুঝে না, সমুদায় জীবই বুঝে, আব্রহ্মস্তম্ভ সবই বুঝে। শুধু ব্যক্তি মানুষে নহে, ব্যক্তি জীবে সমষ্টি প্রতিষ্ঠিত। স্তম্ভে যাহা সুপ্ত, জীবে যাহার স্বপ্নাবস্থা, মানুষে তাহাই জাগ্রত, a spirit which sleeps in the stone, dreams in the animal and awakes in man. মানুষের আত্মায় সমষ্টি জ্ঞানের পূর্ণ মহিমা। যখন তুমি জ্ঞাতা, তখন তৎ অথবা সমস্ত জ্ঞেয়

বস্তুই তুমি,—"তত্ত্বমসি"—ইহাই হিন্দুর চির-নূতন চির-পুরাতন বাণী। এখানে তুমির অর্থ আত্মস্থ তুমি, যখন তোমার অহঙ্কার ওঙ্কার বিলীন হইয়াছে, যখন তোমার সম্বন্ধে ভগবানের এই উক্তি ঘটে,—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানাং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতিসর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ ন মে প্রণশ্যতি॥

Love thy neighbour as thyself—খৃষ্ট বলিয়াছেন কেন তুমি প্রতিবেশীকে তোমারই মত ভাল বাসিবে, খৃষ্টধর্ম্মে তাহার কারণ নির্দ্দেশ নাই,—"তত্ত্বমসি", হিন্দুর সনাতন বাণীতে ইহার উত্তর রহিয়াছে।

তত্ত্বমসি, ইহাই হিন্দুর বিশ্বদর্শনের মূলমন্ত্র, এইখানেই হিন্দু সভ্যতা ও সাধনার পরিচয়, হিন্দুর বিশেষত্বের পরিচয় পাইব।

পুরাণে সমাজ-সৃষ্টি ও আদর্শের কল্পনা

বিশ্বদর্শন ত তত্ত্ববিদ্যা। হিন্দুর বিশ্বদর্শনের দিক হইতে ব্যক্তি ও সমষ্টি সম্বন্ধে মাত্র দুই একটি কথা বলিলাম। বিশ্বদর্শন, তত্ত্বমিমাংসা কি ভাবে সমাজের অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, সমাজের সহিত ব্যবহারে আমরা ঐ তত্ত্বকে কিরূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছি তাহার সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব। হিন্দুর বিশ্বদর্শনের এই ব্যক্তি ও সমষ্টিতত্ত্বের মীমাংসা সমাজদর্শনে কি আকার পাইয়াছে ?

হিন্দুর জীব ও সমাজসৃষ্টির ধারণার একটু আলোচনা করিলেই আমরা এ সম্বন্ধে জানিতে পারিব। আমাদের পুরাণ বলিয়াছেন, নারায়ণ, সর্ব্বজীবাধার, তিনিই সমষ্টি নর, আবার তিনি ব্যক্তি জীব, ব্যষ্টি নরেও পূর্ণ মহিমায় বিরাজিত। নারায়ণ এক নিত্য, সর্ব্বাধার ও সর্ব্বাশ্রয়, তিনিই সমষ্টিজীব, আবার তিনি বহু হইয়াছেন, বহু হইয়া সর্ব্বজীবের অন্তরে

রহিয়াছেন। ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবের একাধারে বীজ ও আশ্রয় নারায়ণ। জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর,—নরত্বের মূল ও পরিণতি নারায়ণ। পুরাণ কহিয়াছেন,—

(ক) প্রথম পুরুষ, কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু; সৃষ্টি, স্থিতি লয় তখন তাঁহাতে প্রতিবিম্বিত। তিনিই মহত্তত্ত্ব, সমগ্রবিশ্ব তখন মহত্তত্ত্বে লীন।

(খ) দ্বিতীয় পুরুষ, গর্ভোদকশায়ী, জীবসমষ্ট্যন্তর্য্যামী, তিনি বিরাট্, হিরণ্ময় পুরুষ। "হিরণ্ময় সেই পুরুষ জলমধ্যে অণ্ডের অভ্যন্তরে সকল অনুশায়ী জীব লইয়া বাস করিয়াছিলেন।" (ভাগবতপুরাণ) দ্বিতীয় পুরুষ সমগ্রব্রহ্মাণ্ডের সমগ্রজীবের আত্মা। তিনি সকলের বীজ ও আশ্রয়, জীব-সমষ্টির তিনিই আধার।

(গ) তৃতীয় পুরুষ—ক্ষীরোদকশায়ী, ব্যক্তিজীবনান্তর্য্যামী; যখন জীবসকল পৃথগ্‌ভাবে প্রাদুর্ভূত হয়, তখন তিনি তৃতীয়পুরুষ হইয়া প্রতি-জীবের আত্মা বলিয়া পরিগণিত হন।

"অগ্নি যেরূপ নিরুদ্ধবীর্য্য হইয়া দারুতে অবস্থান্ করে, ভগবান সেরূপ জলমধ্যে ছিলেন।" স্থূল বা সূক্ষ্ম যাহা কিছু, সবই তাঁহার অন্তঃশরীরে নিহিত ছিল। "তাহার পর তিনি কালাখ্য আত্মশক্তিকে প্রবোধিত করিয়া কর্ম্মপরায়ণ হইলেন। তখন তিনি আপনার দেহমধ্যে লীন সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।" "নারায়ণ অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম অর্থসমূহে দৃষ্টিনিবেশ করিলে অন্তর্গত সেই অর্থ কালানুযায়ী রজোগুণ দ্বারা ক্ষোভিত হইয়া তাঁহার নাভিদেশ হইতে সহসা একটী পদ্মকোষ বাহির হইল।" নারায়ণ সেই পদ্মে প্রবেশ করিলেন; সেই পদ্মমধ্যে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

মনু বলিয়াছেন, স্বয়ম্ভূ সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রার সহিত এই সমুদয় সৃষ্টি আনুপূর্ব্বিক সূক্ষ্ম হইতে স্থূল ও স্থূল হইতে স্থূলতর ক্রমে সৃষ্টি করিলেন। পৃথিব্যাদি লোক-সকলের সমৃদ্ধি কামনায় তিনি আপনার মুখ, বাহু, উরু, ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ সৃষ্টি

করিলেন। তিনি আপনার দেহকে দ্বিধা করিয়া অর্দ্ধেক অংশে পুরুষ ও অর্দ্ধেক অংশে নারী সৃষ্টি করিলেন এবং সেই নারীর গর্ভে বিরাট্‌কে উৎপাদন করিলেন! সেই বিরাট্‌পুরুষ তপস্যা করিয়া যাহাকে সৃষ্টি করিলেন, আমি সেই মনু। আমি দশ প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিলাম; প্রজাপতিগণ আবার সপ্তমনুর সৃষ্টি করিয়া স্থাবর-জঙ্গম সমুদয়ই সৃষ্টি করিলেন।

আমাদের এই জীবসৃষ্টির বিরাট্ কল্পনার অর্থ আমরা এখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। অথচ এই কল্পনার ভিতরই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের, আমাদের সমাজের ও নিখিল মানবের আদর্শ সূচিত হইয়াছে।

এ যে পুরাণের কথা। পুরাণ শুধু ইতিহাস নহে, পুরাণ ইতিহাসের মত যে শুধু বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের অন্ধকার পথে আলো দেখা নয়, তাহা নয়; পুরাণ শুধু নরোত্তমের জীবনীর কাহিনী শুনাইয়া যে আমাদিগকে নরোত্তম হইতে শিখায়, তাহাও নয়। পুরাণ কেবল হিষ্টরি (History) ও বায়োগ্রাফি (biography) নয়, পুরাণে আমাদের য়্যাপ্লায়েড ফিলজফি (applied philosophy)। আমাদের তত্ত্ববিদ্যা ও তত্ত্বমীমাংসা পুরাণেই লোকশিক্ষার উপযোগী হইয়াছে। তত্ত্বদর্শনের হিসাবে কেমন করিয়া আমি মোক্ষলাভ করিতে পারি, তাহাই সহজ ও সরল ভাবে আমার পুরাণে পাইব।

নারায়ণ সমষ্টি মানব, মানবে নারায়ণের ব্যষ্টিবিকাশ

আমার পুরাণ বলিয়াছেন,—জগতের অসংখ্যজাতীয় জীব প্রথমে এক বিরাট্ পুরুষের গর্ভশায়ী ছিল। তাহার পর সেই এক বহু হইলেন। হিরণ্যগর্ভ বহুরূপে বিভক্ত হইলেন, তিনি দেশকালসীমাবদ্ধ হইয়া ব্যক্তিরূপে শরীরী হইলেন। "যাহা কিছু মনের গ্রাহ্য, যাহা কিছু চক্ষুরাদির গ্রাহ্য, যাহা কিছু বুদ্ধির গম্য, তৎসমুদয়ই তাঁহার রূপ।" (বিষ্ণুপুরাণ) তিনি বহু হইয়া অসংখ্য জাতীয় জীব হইলেন, তিনি বহু বা ব্যক্তিরূপে

বিরাট্ শরীরে অভিব্যক্ত হইলেন। যাহা কিছু এই পৃথিবীর, সবই তন্ময়, তদাধার, তৎসৃষ্ট ও তদাশ্রিত, নিখিল জগৎ তাঁহার জ্ঞানাত্মকরূপ। নিখিল জীবই তাঁহার ব্যষ্টিবিকাশ। সমগ্র মানবজাতি তাঁহার বিরাট্শরীর। নিখিল ব্যক্তি মানবই তাঁহার ব্যষ্টিবিকাশ। তিনি আপনাকে নারী ও পুরুষে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া বিরাট্কে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। বিরাটের সন্তান মনু। এবং মনুই স্থাবর-জঙ্গমের স্রষ্টা। মনুর সন্তান আমরা জীব-জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

এই বিরাট্ মানবসমাজ নারায়ণের বিরাট্ শরীর; নারায়ণ দেশকাল-সীমাবদ্ধ হইয়া খণ্ড খণ্ড সমাজে নিত্য অভিব্যক্ত, এবং প্রত্যেক নরেও তিনি নিত্য প্রতিভাত। নারায়ণই বিশ্বমানব। আমরা একটি 'নর' দেখিয়া বিশ্বমানবের ধারণা করি না। নানা সমাজের মানুষ দেখিয়া আমরা প্রথমে তাহাদের গুণসমষ্টি কল্পনা করি; বিশেষ নর কোন সাধারণ ধর্ম্মের দ্বারা অবস্থানুসারে "নরোত্তম" হইল তাহাও পর্য্যবেক্ষণ করি। বিশ্বমানব বলিলে আমরা শুধু মানবের সাধারণ গুণসমষ্টি বুঝি না; কোন্ সাধারণ গুণবলে অবস্থানুসারে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়, তাহাও কল্পনা করি। "নরোত্তম" কোন্ সামান্য ধর্ম্মবলে "নারায়ণে" (বিশ্বমানবে) পরিণত হয়, তাহারও ধারণা করি।

নর, নরোত্তম ও নারায়ণ

নারায়ণই নরত্বের মূল। নরের জ্ঞানাত্মকরূপ নারায়ণ। নরোত্তমের সাধনা নারায়ণে লীন হওয়া। বিশ্বমানবই মানবত্বের মূল, পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও পরিণতি,—বিশ্বমানবে।

যিনি নারায়ণ, বিশ্বমানব, তিনি অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ, তিনি দেশকালের সীমাবদ্ধ নহেন, তাঁহার জ্ঞানে অতীত বর্ত্তমানের ন্যায় নিত্য প্রতিফলিত, ভবিষ্যৎও বর্ত্তমানের ন্যায় পূর্ণরূপে প্রতিভাত। তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের নিকট কালও যে সান্ত। মানব-সমাজ ও মানব-সভ্যতা তাঁহারই কাল-

শক্তি বশে ক্রমাভিব্যক্ত হইতেছে। আমরা অজ্ঞান, মায়াবদ্ধ জীব। আমাদের সমাজও অজ্ঞানজড়িত, মায়ার বন্ধনে শৃঙ্খলিত। আমরা দেশকালের সীমা লঙ্ঘন করিতে পারিতেছি না। আমাদের হৃদয়ে নারায়ণ এখন সুপ্ত রহিয়াছেন। আমাদের সমাজ এখন নারায়ণের বিরাট্ নিদ্রার প্রতিমূর্ত্তি। নারায়ণ, নরোত্তম, নর কেহই এখন জাগরিত অবস্থায় নাই।

বৈষ্ণবী-শক্তি—সমাজ সৃষ্টি-স্থিতির শক্তি

নিদ্রিত নারায়ণ, আর কতকাল নিদ্রিত থাকিবেন? নিদ্রিত জীব, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত,—"জননি জাগৃহি" বলিয়া একবার আবাহনমন্ত্র পাঠ কর! জননী ভিন্ন যোগনিদ্রায় মগ্ন নারায়ণকে কে উদ্বুদ্ধ করিবেন, সুপ্ত নরকে কে চৈতন্য দিবেন? জননীই বৈষ্ণবীশক্তি। জননীর সেই সর্ব্বাত্মিকা মহাশক্তিবলেই নারায়ণ সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সম্পাদন করেন। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াত্মক নিখিল জগতের একমাত্র হেতু আমাদের জননী। তিনি রাগাদির বিষয়ীভূত নহেন, তাই তিনি হরি-হরাদিরও বুদ্ধির অতীত। তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, যখন প্রলয়ে সকলই বিলয়প্রাপ্ত, তখন কেবলমাত্র অনন্ত-মহাকালস্বরূপিণী তিনি আপনার শক্তি প্রদান করিয়া অনন্তশয়নশায়ী নারায়ণের চেতনা সম্পাদন করেন। তাঁহারই বলে বিশ্বসমাজের সৃষ্টি, রক্ষা ও পোষণ হইয়া থাকে। তিনি ব্রহ্ম-শক্তি।

তিনি সর্ব্বভূতে "চৈতন্য"রূপে থাকিয়া আমাদিগকে কর্ম্মে প্রেরণ করেন। তিনি সর্ব্বভূতে "বুদ্ধি"রূপে থাকিয়া "আমিত্বের" জ্ঞানবিকাশের সহায় হন। তিনি সর্ব্বভূতে "ক্ষুধা," "তৃষ্ণা" রূপে থাকিয়া আমাদিগকে কর্ম্ম করিতে বাধ্য করান।

জাতিরূপা ও মাতৃরূপা

তিনিই সমাজ-স্থিতির মূল। তিনি মনুষ্যকে নানারূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ করেন। "ক্ষমা" (ক্ষান্তিঃ), "লজ্জা" (স্বকার্য্যাবিষয়ান্তজ্ঞানভীতি). "শান্তি"

(বিষয়োপরমরূপ ইন্দ্রিয়সংযম) এবং "শ্রদ্ধা" (আস্তিক্যবুদ্ধি), মানবের অন্তরে তিনি এই সকলরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে সমাজবদ্ধ করেন। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।" জননী জাতি-স্বরূপা হইয়া "বৃত্তি" (জীবনোপায়) ও "তুষ্টি" (সন্তোষ) "লক্ষ্মী" (ধনাদিসম্পৎ) "কান্তি" (কমনীয়তা) রূপে অধিষ্ঠান করেন। মাতৃরূপা তিনিই আমাদের সমাজশক্তি। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।"

জীব-জগতে বংশ বা জাতিরক্ষার একমাত্র কারণ, মাতাপিতার সন্তান পালনের প্রবৃত্তি (instinct)। কিন্তু জীব যতই উন্নত হয়, ততই সন্তানের সংখ্যা কমিতে দেখা যায়। জীবন-সংগ্রামে সেই জীবই টিকিয়া যায়, যাহার সন্তান অল্পসংখ্যক অথচ সক্ষম। মানুষে পৌঁছিলে আমরা সেই একই নিয়ম দেখি, সেই সকল শ্রেণীর মধ্যে সন্তানের সংখ্যা বেশী, যাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত মানসিক উন্নতি (individual development) কম। কিন্তু অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতায় একটা কঠিন সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে প্রত্যেক জাতির মধ্যে জন্ম-হার খুব কমিয়া যাইতেছে। মাতাপিতার স্বচ্ছন্দ আহার বিহারের ইচ্ছা সন্তান-সন্ততি উৎপাদনের এতই অন্তরায় হইয়াছে, যে অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন, জাতি-রক্ষা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। "When the pleasure-seeking of parents or their welfare in any other regard comes to dominate the racial responsibility, then it is no longer in harmony with the condition which a permanent society is bound to enforce" বিশেষতঃ ফরাসী সমাজ পিতামাতার দায়িত্ব-বোধহীনতার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দশাপন্ন। সমাজ-রক্ষা, জাতি-রক্ষার দিক্ হইতে মাতৃত্বের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা বুঝিলাম।

মাতৃত্বের বিকাশ ও সমাজপুষ্টি

শুধু রক্ষা নহে, সমাজের উন্নতি ও জাতির উন্নতির জন্য মানুষে মাতৃশক্তির বিকাশ একান্ত আবশ্যক। জীবজগতে মাতার সন্তান পালন একটা instinct, মানুষে তাহাই কর্ত্তব্যজ্ঞানে পরিণত। জীবে যাহা আপন সন্তান রক্ষা ও পালন, মানুষে তাহা ক্রমশঃ নিজ সন্তান, আত্মীয়-সন্তান, ও স্বজাতি-সন্তান রক্ষা ও পালনে পর্য্যবসিত হয়। মাতৃশক্তি পরার্থবৃত্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ। মাতার পরার্থধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ত্যাগধর্ম্ম। তাই সমাজের উন্নতি মাতৃত্ব-শক্তির বিকাশের সহিত হইতে থাকে, সমাজ-রক্ষা ও সমাজের উন্নতির মূল মাতৃত্বের বিকাশ। Drummond লিখিয়াছেন, "The machinery of Nature is designed in the last resort to turn out Mothers. It is a fact which no human mother can regard without awe, which no man can realise without a new reverence for women, and a new belief in the higher meaning of nature, that the goal of the whole plant and animal kingdom, seems to have been the creation of a family which the very Naturalist has had to call Mammalia—Mothers."

জীবজগতে মাতৃত্বের বিকাশ সাধনই জীবের বংশবৃদ্ধির মূল। মনুষ্য-সমাজে সেবাধর্ম্ম, ত্যাগধর্ম্ম, পালনধর্ম্ম—মাতৃধর্ম্মের বিকাশই সমাজের উন্নতির মূল। জীব-জগতে ও মনুষ্য-জগতে আমরা সেই একই বিশ্বজননীর লীলা দেখিতেছি। নিখিল জীবাশ্রয়া বিশ্বজননী বিশ্বজগৎকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, আবার আপনাকে নিখিল অংশে বিভক্ত করিয়া নিখিল জীবের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। জীবের উন্নতির জন্য তিনি তাহাকে আপনার ধর্ম্ম—ত্যাগ ও পালনধর্ম্ম শিখাইয়াছেন। জীবের জ্ঞানবিকাশ নাই, সে বিশ্বজননীর নিকট হইতে মাতৃশক্তি পাইয়াও মাতৃত্বের পূর্ণমহিমা বুঝিতে

অক্ষম। জীবের রক্ষা ও পালনধর্ম্ম তাহার পক্ষে একটা instinct মাত্র। কিন্তু বিশ্বজননী মনুষ্যের অন্তরে বুদ্ধি দিয়াছেন। মনুষ্যই মাতৃত্বের পূর্ণমহিমা অনুভব করিতে পারে। মানুষ বিশ্বজননীর নিকট মাতৃশক্তি লাভ করিয়া শুধু যে আপনার সন্তান রক্ষা ও পালন করিতেছে, তাহা নহে, এ বিরাট্ মানব সমাজেই তাহার পরার্থ কর্ম্মের ক্ষেত্র হইয়াছে। মনুষ্যের অন্তরে মাতৃ-শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ক্রমোন্নতি হইতেছে। বিশ্বজননী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপিণী হইয়া ব্যাপ্ত রহিয়াছেন; আবার অনন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তিনি নিখিল মনুষ্যহৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া মনুষ্য-জাতি ও মনুষ্যসমাজের ক্রমোন্নতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। এই ক্রমবিকাশ বা ক্রমোন্নতি বিশ্বজননীর লীলা,—জীব ও জড়জগতে ইহাকে evolution বলে, মনুষ্যজগতে ইহাকে ইতিহাস বলে। নারায়ণী লীলার আদি নাই, অন্ত নাই, ইহা শুধুই লীলা।

লীলাময়ি, তুমি নরকে চৈতন্য প্রদান করিয়া তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছ, তুমি নরোত্তমকে কর্ম্মে প্রেরণ করিয়াছ, আবার তাহাকে নারায়ণের নিকট লইয়া পৌছিয়াছ। মানুষ তোমারই শক্তিসঞ্চারে জগতের শ্রেষ্ঠ জীব হইয়াছে, তুমি যে তাহাকে বুদ্ধি দিয়াছ,—তোমার পালনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মানুষ আপনার উন্নতি এবং স্বজাতি ও সমাজের উন্নতি সাধন করিয়াছে,—সুন্দর ও বিরাট্ সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তুমি তোমারই দেওয়া শক্তির খেলা দেখিতেছ, আবার যখন অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে, তখন নিজেই তুমি শরীর পরিগ্রহ করিয়াছ।

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

পূর্ব্বে করিয়াছ, ভবিষ্যতেও করিবে। তুমি নারী, মাতা,—তোমারই শক্তিসঞ্চারে চিরকাল নর নরোত্তম বা আদর্শ মানব হইয়াছে। আদর্শ মানবের কল্পনার পরিণতি,—সমষ্টিমানব বা নারায়ণ। তুমি নারায়ণীশক্তি,

ব্যক্তিমানবকে তুমি সেই সমষ্টিমানবের জ্ঞানে নিত্য লইয়া চলিতেছ। তোমার কৃপা আমরা পাই নাই, তাই মনুষ্যত্বের আদর্শে আমরা আমাদিগের ব্যক্তিগত জীবন গঠন করিতে পারিতেছি না, তাই সমষ্টিমানবের জ্ঞান আমাদের কল্পনাতেও আসিতেছে না। তুমি একবার কৃপা করিলে, এই হিন্দুসমাজের বিরাট্ দেহে আমরা তোমার অনুপম কান্তি দেখিব, তোমার শক্তিসঞ্চারে ইহাকে জাগরিত নারায়ণ বলিয়া সেবা করিব এবং নরনারায়ণের সেবা করিতে নিজেরাও নরোত্তম হইয়া তোমার লীলার মহিমা গান করিতে করিতে সেই পুরুষোত্তমে লীন হইব। আমাদের নরত্বলাভ তখনই সার্থক হইবে। আমাদের জাতি ও সমাজের সাধনাও তখন সফল হইবে।

জাতীয়তা ও বিশ্বজনীনতা

ইউরোপে স্বরাষ্ট্র ও স্বাধিকার লাভের আন্দোলন

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় জীবনে আমরা দুইটি আন্দোলনের বিশেষভাবে পরিচয় পাই।

(ক) জাতীয়তার পুষ্টিসাধন; যখন কোন লোকসমাজ তাহার ভাষা, আচার ব্যবহার, অথবা রাষ্ট্রীয় সুবিধা অসুবিধার ঐক্য অনুভব করিয়াছে, তখনই তাহা স্বরাষ্ট্র গঠনের সুযোগ খুঁজিয়াছে, পররাষ্ট্রের নিকট পরাধীনতা অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এককথায় "জাতীয়ত্ব" লাভের উদ্যোগ করিয়াছে।

(খ) স্ব-রাষ্ট্র, স্বরাজ লাভ করিয়া, লোক-সমাজের আদর্শ হইয়াছে প্রজাতন্ত্র-প্রতিষ্ঠা। প্রত্যেক ব্যক্তির যাহাতে স্বরাষ্ট্রে স্বাধিকার থাকে, তাহার সুবিধাবিধান করা।

প্রথমে স্ব-রাষ্ট্র লাভ, তাহার পর স্ব-রাষ্ট্রে স্বাধিকার লাভ। জাতীয়তা লাভের পর সাম্যতন্ত্রের ভিতর দিয়া ব্যক্তিত্ব গঠন—ইহাই ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের গোড়াকার কথা।

জাতীয়তা ও জাতীয় আত্মম্ভরিত্ব

জাতীয়তার আদর্শ তখনি সম্পূর্ণ, যখন স্বরাজ লাভ হইল। কিন্তু ইউরোপে তাহা হয় নাই। জাতীয়তা জাতির আত্মম্ভরিত্বে পরিণত হইয়া ইউরোপে শতাব্দীর পর শতাব্দী যুদ্ধবিগ্রহের কারণ হইয়াছে। সেই ধর্ম সংস্কারের যুগ, যখন হইতে রোমীয় চার্চ্চ ও Holy Roman Empire কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমগ্র ইউরোপের আধ্যাত্মিক ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আদর্শ মলিন হইতে লাগিল, তখন হইতে জাতিসমুদয়ের আত্মম্ভরিত্ব ইউরোপে চির

অশান্তি আনিয়া দিয়াছে। নেপোলিয়নের বিপুল পরাক্রম তাঁহার শত্রু জাতিসমুদয়ের ক্ষুদ্র স্বার্থানুসন্ধিৎসা কিছুকাল স্থগিত রাখিয়াছিল। সকল জাতিরই একটা আশু বিপৎসম্ভাবনায় তখন জাতীয়ত্ব কিছু খর্ব্ব হইয়াছিল। কিন্তু আবার একটা হিংস্র ভাব জাগিয়া উঠিল। বিস্‌মার্ক ও ডিস্‌রেলির রাষ্ট্রনীতি অন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে এই হিংস্রতারই পরিচায়ক। তখন হইতে নীচ রাষ্ট্রনীতিরই প্রতিপত্তি,—সে নীতি অনুসারে এক জাতি অপরের অনিষ্টসাধন করিয়া আপনার উন্নতির সুযোগ খুঁজে। সমগ্র ইউরোপ এই নীচ রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। ইউরোপ, আফ্রিকা, এসিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা সবই এই কূট রাষ্ট্রনীতিরই লীলাক্ষেত্র।

জাতীয়তার আদর্শ স্বরাজ-স্থাপন। স্বরাজ-স্থাপন করিয়া, ব্যক্তির স্বরাষ্ট্রে অধিকার স্থাপন করিয়া জাতির বৃহত্তর আদর্শের দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত। ব্যক্তি—সমাজ—জাতি—বিশ্বমানব—একধাপ হইতে আর এক ধাপে উঠা ইহাই হইতেছে আদর্শ। হেগেলের ইতিহাস দর্শনের মূল কথা ইহাই; কিন্তু ইউরোপে জাতীয়তা জাতির আত্মম্ভরিত্বে Chauvinismএ পরিণত হইয়াছে। হেগেল বলিয়াছেন, আসল ব্যক্তিত্ববিকাশ ব্যক্তি-সর্ব্বস্বতায় নহে, সামাজিকতায়। ব্যক্তিগত জীবন হইতে সামাজিক জীবন, সামাজিক জীবন হইতে জাতীয় জীবন—ইহাই হইতেছে উন্নতির সোপান। আবার জাতীয়তা হইতে সার্ব্বজনীনতায় অগ্রসর হওয়া চাই। সেরূপ আসল জাতীয়তা জাতি-সর্ব্বস্বতায় নহে। কিন্তু ইউরোপ তাহা শুনে নাই। ইউরোপের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় আদর্শ হইয়াছে একটা নিকৃষ্ট জাতীয়তা, তাহা নিতান্ত স্বার্থপর ও আত্মসর্ব্বস্ব। ইউরোপে সর্ব্বজাতীয় আদর্শ পরিস্ফুট হইতে পায় নাই।

অন্তর্জ্জাতীয় আইনকানুন

তবুও বিভিন্ন জাতির স্বার্থ এমন ভাবে পরস্পর জড়িত যে, অনেক কাল হইতেই একটা বোঝাপড়ার প্রয়োজন হইয়াছিল।

ব্যবসা, বাণিজ্য, লোকের যাতায়াত, পোষ্ট ও টেলিগ্রাম, পেটেণ্ট ও কপিরাইটের আইন এবং যুদ্ধের নিয়মকানুন লইয়া বিভিন্ন জাতি একটা বোঝাপড়ায় মতের ও স্বার্থের মিলে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। এই সকল বিষয় লইয়া তাহারা সকলে যে সকল বিধি শিরোধার্য্য করিতে ও নিষেধ সম্মান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, তাহারই নাম অন্তর্জ্জাতীয় আইনকানুন। আইন না মানিলে শাস্তি পাইতে হইবে, কিন্তু অন্তর্জ্জাতীয় ক্ষেত্রে তাহা হইবার সুবিধা ঘটে না। কে শাস্তি দিবে? যাহার স্বার্থ হানি হইল, যাহার ক্ষতি হইল, সেই কি শাস্তি দিবে? যদি সে দুর্ব্বল হয়, আর যে আইন ভাঙ্গিল সে প্রবল পরাক্রমশালী হয়? একটা সর্ব্ব-জাতীয় সেনা ও নৌবল যতকাল না গঠিত হয়, ততকালই দুর্দ্দান্ত জাতি অন্তর্জ্জাতীয় মিল ও সন্ধিপত্রকে এক টুকরা কাগজ বলিয়া উড়াইয়া দিবেই। আর কেহই ইহার প্রতিকার করিতে পারিবে না। সেই ১৬২৫, ও ১৬৭২ গ্রোটিয়াস ও পুফেনডর্ফের কাল হইতে ষ্টেড, ও নরমান আঞ্জেলের একাল পর্য্যন্ত শান্তি-রক্ষার, অন্তর্জ্জাতীয় সন্ধি ও মিলের কত না চিন্তা ও আয়োজন হইয়াছে, তাহার ত কিছুই ফল হয় নাই।

সর্ব্বজাতীয় পুলিশ পাহারালা

সর্ব্বজাতীয় নৌবল ও সেনাবল! সে-ও ত আবার সেই বলেরই প্রতিষ্ঠা, জোর যার মুলুক তার সেই আইনের ব্যাপক ভাবে কল্পনা! কিন্তু তাহা না হইলে ইউরোপে হইবে না। দেশের ভদ্রসমাজ দেশের আইন মানে, শান্তিভঙ্গ করে না, কাহার সহিত বিবাদ মারামারি করে না, কাহাকেও হত্যা করে না, শাস্তি বা জেল আছে বলিয়া নহে, ফাঁসি-কাঠ আছে বলিয়া নহে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান, আইনের বিধিনিষেধ নহে, তাঁহাকে সৎপথে চালায়। কিন্তু জগতের অন্তর্দ্দেশীয় নীতি, ভদ্র-সমাজের উপযুক্ত নহে। সেখানে শাস্তির ভয়, পুলিশ পাহারালা-

সম্মিলিত সেনাবলের ভয় দেখান চাই, তবেই শান্তিরক্ষা হইবে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান দেশের লোকের মধ্যে দেশেই আবদ্ধ, বাহিরে অন্তর্দ্দেশীয় ক্ষেত্রে 'জোর যার মুলুক তার' এই ধর্ম্মেরই প্রতিষ্ঠা।

নরম্যান য়্যাঞ্জেল

আশ্চর্য্য এই, যদিও 'জোর যার মুলুক তার' এই নীতিরই প্রতিপত্তি, কিন্তু বাস্তবিক ইউরোপের অন্তর্জ্জাতীয় ক্ষেত্রে যে 'জোর যার মুলুক তার' ঠিক, তাহা নহে। বিভিন্ন জাতির ব্যবসায়-স্বার্থ এতই পরস্পর জড়িত যে, জোর করিয়া মুলুক লাভ করিলে অনেক সময়ে স্বার্থহানিই হইবার সম্ভাবনা। নরম্যান য়্যাঞ্জেল অনেকদিন হইতে বুঝাইতেছেন যে, ইউরোপে যুদ্ধ করিলে বণিগ্‌জাতি সমুদায়ের ব্যবসায়ে এত বেশী ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা যে রাজ্যলাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও তাহার জন্য বিপুল নৌ ও সেনাবলের আয়োজন একটা নিতান্ত ভ্রম। প্রত্যেক জাতির বিদেশে এত বেশী মূলধন খাটিতেছে, প্রত্যেক জাতির স্বার্থ অন্তর্জ্জাতীয় বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি লইয়া এতই পরস্পরসম্বদ্ধ যে, এক জাতির অনিষ্ট হইলে অপর সকল জাতিরই অনিষ্ট হইবে।

বিভিন্ন জাতির ভাবসম্পদ্

শুধু জাতির স্বার্থের দিক্ দিয়া নহে। প্রকৃত জাতীয়তার পুষ্টিবিধান আত্মসর্ব্বস্বতায় হয় না। ব্যক্তিত্ববিকাশ সমাজের বিভিন্ন জাতির ভাব-সম্পদের আদানপ্রদানেই পুষ্ট হয়। স্বাতন্ত্র্যের পথে নহে বিশ্বের পথে,—জাতীয়তার পুষ্টিসাধন। বিশ্বজীবন স্বতন্ত্র জাতিকে এক করিয়া তাহাদের যোগফলে পাওয়া যাইবে না।

স্বাতন্ত্র্যের পথ

বিশিষ্ট জাতির স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি প্রয়োজন। এক একটা বিশিষ্ট জাতির স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়া কত না রস ফুটিয়া উঠে। সৎ, অসৎ,

সুন্দর, অসুন্দর, নিত্য, অনিত্য সম্বন্ধে কত না জ্ঞান এক একটা জাতির অন্তরের মধ্যে নিগূঢ়ভাবে প্রকাশিত হয়। সেই জ্ঞান লইয়া তাহারই ধ্যানে সে শতাব্দীর পর শতাব্দী ডুবিয়া রয়, তাহারই ভাবের ঘোরে সে কত না নিত্য নূতন রসের সৃষ্টি করে, আর সেই রসের সে কত না বিচিত্র মূর্ত্তি খুঁজে। তাহার রাষ্ট্র, তাহার সমাজ, তাহার সাহিত্য, তাহার আর্ট, নীতিধর্ম্ম সকলেরই ভিতরই তাহার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে সেই জ্ঞানই লুকাইয়া রহিয়াছে, আর সে ঐ সকল আধারে তাহার সাধনার ধন জ্ঞান-বস্তুকে পাইয়া কত না আনন্দ অনুভব করে।

কিন্তু এ চরম আনন্দ নহে। এক একটা বিশিষ্ট জাতি স্বাতন্ত্র্যের পথে আনন্দ লাভ করে সত্য, কিন্তু সে পূর্ণানন্দ নহে। সে আনন্দ ক্ষণিকের, তাহাকে একমাত্র আশ্রয় করিলে হাঁফাইয়া উঠিতেই হইবে। চাঞ্চল্যের প্রলয়-বাতাস বহিলে, নিরাশা-অবসাদের অন্ধকার আসিলে, জাতি তখন মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিবে। স্বাতন্ত্র্যের পথে তাহাকে একদিন না একদিন মহাশূন্য দেখিতেই হইবে।

স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়াই বিশ্বজীবন

স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়া চাই। বিশেষের পথে বিশ্ব মিলিবে না। বিশেষ হইতে উর্দ্ধ ভূমিতে উঠিতে হইবে। বিশ্বই পরম জ্ঞান ও আনন্দ-বস্তু, জাতির স্বাতন্ত্র্যের পথে মুক্তি নাই। বিশ্বজীবনেই মুক্তি; বিশ্বজীবন বিশিষ্ট জাতীয় সাধনা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। বিশিষ্ট জাতির সাধনা সার্থক হয় বিশ্বজীবনবস্তুকে লাভ করিয়া।

পাশ্চাত্য জগতে বিশ্বজীবন-বস্তুতে অবিশ্বাস

বর্ত্তমান সভ্যতার রাষ্ট্রীয় আদর্শ হইয়াছে,—জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ-সাধন। বিশিষ্ট জাতি বিশিষ্ট জাতীয়-সাধনা-লব্ধ জ্ঞান-বস্তুকে চরম আনন্দের জিনিস বলিয়া ধরিয়াছে; বিশ্বজীবন বস্তুকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। প্রত্যেক

জাতির বিশিষ্ট সাধনার বস্তু, প্রত্যক্ষ। তাহা চরমলাভের বস্তু—এই অনুভূতির ফলে সেখানে এত মারামারি কাটাকাটি। সে যে এক টুক্‌রা পাঁউরুটির মত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাই পাঁউরুটির কিছু অংশ ভাঙ্গিয়া মাটিতে পড়িল, এই লইয়া তুমুল সংগ্রাম। বিশ্বজীবন-বস্তু—পরোক্ষ, তাহা লইয়া স্বত্ব জন্মায় না, তাহাকে ভাগবাটোয়ারা করা যায় না, তাহা 'জোর যার মুলুক তার' ধর্ম্মের অতীত।

হিন্দুর বিশিষ্ট ও বিশ্বজনীন জ্ঞানের সমন্বয়

প্রাচ্য জগৎ বৈশিষ্ট্যের দিকে নহে, বিশ্বের দিকে অধিক মন দিয়াছিল; তাই বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিতে পায় নাই। হিন্দু ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য যখন পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তখন সে বিশ্বজীবন-বস্তুর সহিত সম্যক্ পরিচয়ও লাভ করিতে পারিয়াছিল। শক, হুন, চীনের বিক্রম পরাক্রম তখন হিন্দু ভারতবর্ষের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করিতে পারে নাই। তখন হিন্দুর নিত্য অনিত্য সুন্দর অসুন্দর সত্য অসত্যের জ্ঞান শুধু অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রে নহে—রাষ্ট্র, সমাজ, আর্ট, সাহিত্য সকল ক্ষেত্রেই প্রতিভাত হইয়াছিল। হিন্দু জাতির অন্তরের মধ্যে, প্রাণের ভিতর সেই সাধনালব্ধ জ্ঞান সমাজ-দেহের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট ছিল। আর সেই জ্ঞানের সহিত বিশ্বজ্ঞান-বস্তুরও তখন একটা আনন্দযোগ ছিল। হিন্দুজাতি তাহার বিশিষ্ট জ্ঞানকে সাধনাবলে বিশ্বজনীনরূপে লাভ করিতে পারিয়াছিল। যাহা তাহার বিশিষ্ট সাধনা-বস্তু তাহা বিশ্বজীবনবস্তু, তাহা পরোক্ষ, এই জ্ঞানলাভের ফলে হিন্দুজাতি সেনাবলের দ্বারা দিগ্বিজয় করিতে বাহির হয় নাই, ভিক্ষুক, প্রচারক, শ্রমণের দ্বারা হিন্দু দিগ্বিজয় করিয়াছে। হিংসা বিদ্বেষ হিন্দুর দিগ্বিজয়ে প্রশ্রয় পায় নাই, অহিংসা মৈত্রীরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গেল, চীন ও জাপান ভারতের সহিত মৈত্রীর বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই। নবীন মোহান্ধ জাপান বুঝি এতকাল পরে সে বন্ধন ছিন্ন করিতে চলিল!

সমগ্রতার অনুভূতির অভাবে বর্ত্তমান সমাজ, ধর্ম্ম ও আর্টে উচ্ছৃঙ্খলতা

আজ হিন্দুর সমাজ-দেহে অতীতের মত সে বাস্তব জ্ঞান সঞ্চারিত হইতেছে না। রাজ্য, সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি, সাহিত্য, আর্ট, সব ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হইয়া একটা সমগ্র জ্ঞানের অনুভূতি নাই। ব্যক্তিগত সাধনার ফলে সমাজ, ধর্ম্ম, সাহিত্য, আর্ট সব ক্ষেত্রেই ভাবুকতা আছে, কিন্তু সে ভাবুকতা সমগ্রতার অনুভূতির অভাবে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের ধর্ম্ম, সাহিত্য ও আর্ট বিশ্বজনীন বস্তুর সাক্ষাৎলাভ করিয়াছে। কিন্তু বিশ্বজনীন বস্তুজ্ঞান ব্যক্তিগত হইয়া রহিয়াছে। আমরা হাজারবার বলি না কেন—

"হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে
জাগরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।"

ভারতের পুণ্যতীর্থে মানব-মহামিলনের কল্পনা যে অলীক, তাহা নিঃসন্দেহ। অধ্যাত্ম-ক্ষেত্রে লব্ধ জ্ঞান তাহার রাষ্ট্র ও সমাজের ভিতর দিয়া সমগ্র জাতির অন্তরের মধ্যে ব্যক্তি অনুভব করিতে পারে না বলিয়া সে জ্ঞান, অলীক, বস্তুতন্ত্রহীন হইয়া রহিয়াছে। সে জ্ঞান চরম সত্য নহে, কারণ সত্যজ্ঞান যে জ্ঞানের বিকাশ অন্তরে, তাহার বাহিরেও প্রকাশ চাই। চরম জ্ঞান অসীম, 'সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ', সে সঙ্গ পায় নাই বলিয়া সে জ্ঞান অলীক। হিন্দুর চিন্তা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহাই হইতেছে একটা প্রকাণ্ড ট্রাজেডি।

কল্পনা ও বাস্তব

সান্ত্বনালাভ বল কি আশ্রয়লাভ বল, আমাদের হৃদয় জাতীয় জীবন-বস্তুরসে বঞ্চিত হইয়া লুব্ধ মধুপের মত বিশ্বজীবনবস্তুর জ্ঞান ও রসে

বিভোর হইয়া রহিয়াছে। তাহারি নিত্য নূতন মূর্ত্তি আঁকিয়া নির্নিমেষে সে চিত্র দেখিতেছি। সে যে চিত্রপট, সে ত জীবন্ত নহে, শুধু যে একটা ছবি! সে ছবিও আমার ভাল! সে ত আমার মানস প্রতিকৃতি।

আমার জাতি, আমার স্বাতন্ত্র্য, আমার সমগ্রতার আমি কত না ছবি আঁকিতেছি, তাহাকে নটবররূপে সাজাইয়া কত না বেশ কত না স্বপ্নখেলা দেখিতেছি। সেই স্বপ্নের মোহে আমার দেশের সমস্ত লজ্জা অপমান কলঙ্ককে অগ্রাহ্য করিয়া, সেই কলঙ্ককেই আশ্রয় করিয়া আমরা ভাবিয়াছি, "তাহারি লাগিয়া কলঙ্ক কিনেছি জগতে হ'লো না ঠাঁই।"

আমার দেশ, আমার সমাজ, আমার জননী জন্মভূমি হিমগিরিবালা আমার নিকট নব-ভাব-ভঙ্গিনী, নব-রাগ-রঙ্গিণী, অনন্ত লীলা-রূপিণী। আমার জাতির অন্তরতম আত্মা আমার হৃদয়ে লক্ষ অবতার হইয়া নিত্য নূতন লীলা করিতেছেন, আমার দেশ কখনও শ্যামা কখনও অন্নপূর্ণা হইয়া নিত্য নব-ভাবে বিভোরা হইয়া আমার হৃদয়ে খেলিয়া বেড়াইতেছেন। যতকাল আমাদের ব্যক্তিগত ভাবুকতা ও অধ্যাত্ম জ্ঞান সজীব থাকিবে; ততকালই আমরা বিশ্বজনীন বস্তুর সাক্ষাৎলাভ হইতে বঞ্চিত হইব না। কিন্তু আমার জাতি ও আমার দেশের কল্পনার মত সে সাক্ষাৎলাভ মিথ্যা হইবে, কারণ একদিকে যেমন স্বাতন্ত্র্যে বিশেষে আবদ্ধ থাকিলে বিশ্বকে পাওয়া যায় না, সেইরূপ বিশ্বও স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষের পথে না যাইলে অনধিগম্য।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশিষ্টতা

অনেকে বলিতেছেন, ইউরোপীয় সভ্যতার এখন অগ্নি-পরীক্ষা হইতেছে। সমগ্র ইউরোপীয় মহাদেশে যে সমরানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে ইউরোপীয় সভ্যতা পূতশীলা সীতার মত অক্ষত শরীরে বাহির হইয়া আপনার কান্তি ও সৌন্দর্য্যে অচিরেই জগৎকে উদ্ভাসিত করিবে, এবং এই অগ্নি-পরীক্ষা না হইলে পাশ্চাত্য সভ্যতা আসল সৌন্দর্য্য জগতের নিকট অপরিচিত থাকিয়া যাইত, ইহাও অনেকে ভাবিতেছেন।

এটা একটা মস্ত ভুল। যদি বলা যায়, ইংরাজ ও জার্ম্মান, ফরাসী ও শ্লাভের শক্তি ও সাধনার অগ্নি-পরীক্ষা হইতেছে, তাহা হইলে কথাটা মিথ্যা হইবে না। বিশেষতঃ ইংরাজ ও জার্ম্মানের রাষ্ট্রীয় সাধনার এখন বিষম পরীক্ষা! কিন্তু ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীর অগ্নি-পরীক্ষা এবং বর্ত্তমান সভ্যতার অগ্নি-পরীক্ষা ইহা এক কথা নহে।

সভ্যতার ধ্বজা লইয়া কাড়াকাড়ি

যদিও ইহা ঠিক—বর্ত্তমান জার্ম্মানী ও ইংলণ্ড ইউরোপীয় সভ্যতারও পুষ্টি করিতেছে, কিন্তু ইহা বলিলে ভুল হইবে যে বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংরাজ ও ফরাসী অথবা জার্ম্মান সভ্যতার বিচার হইতেছে। যে, জিতিবে, সে-ই জগতে সভ্যতার ধ্বজা জয়োল্লাসে স্থাপন করিবে; আর যে হারিবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বর্ব্বরতা চিরকালের জন্য রসাতলে যাইবে; দুইটার একটাও ঠিক নহে।

কবির লড়াই

এখন যুদ্ধ হইতেছে শুধু ইংরাজ ও ফরাসী, জার্ম্মান সৈন্যের নহে, শত্রুপক্ষীয় দেশের কবি, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকগণেরও লড়াই আরম্ভ হইয়াছে। অয়কেনের সঙ্গে বার্গসাঁর, হার্প্‌ট্‌মানের সঙ্গে মেটারলিঙ্কের,

রলেণ্ডের সঙ্গে হার্প্‌ট্‌মানের এখন লড়াই চলিতেছে, কিপলিঙ্‌ বারেন্স মেটারলিঙ্ক এখন যুদ্ধের কবিতা লিখিতেছেন,—৮২ বৎসরের প্রাচীন দার্শনিক ওয়ানড় এখন লিপ্‌জিগের ছাত্রদিগকে দর্শন-বিদ্যা ছাড়িয়া হনন বিদ্যায় পারদর্শী হইতে উপদেশ দিতেছেন।

তাঁহাদের কৈফিয়ৎ কি? ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী এবং রুশিয়ার সমস্ত বড় বড় সাহিত্যিক ও চিন্তাবীরগণ যে হঠাৎ সকলেই বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন, তাহার কারণ কি? স্ব স্ব দেশের গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহারা প্রণোদিত হন নাই। তাঁহারা স্পষ্টই অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের দেশ ও তাঁহাদের সমাজ এখন একটা জীবন-মরণের পরীক্ষায় প্রবেশ করিয়াছে. সাহিত্যতেই দেশের বা সমাজের অনুভূতির প্রকাশ, এখন সাহিত্য কখনও নির্ব্বাক্‌ থাকিতে পারে? সমগ্র দেশের ভিতর দিয়া যে একটা বিপদাহত জাগ্রৎ চৈতন্যের সাড়া পাওয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান ইংরাজ, ফরাসী বা জার্ম্মান সাহিত্যে তাহারই প্রকাশ দেখা গিয়াছে। চিন্তাশীল সাহিত্যিক-গণকে বলিতে হয় নাই, তাঁহারা নিজেরা বুঝিয়াছেন, সমাজের সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের ভিতর দিয়াই এখন প্রকাশের সুযোগ খুঁজিতেছে. সমগ্র জাতি তাহার আশার কথা শুনিবার জন্য তাঁহাদেই মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছে, এ সময়ে যদি কাহারও মুখে ভাষা না ফুটে, তবে লজ্জার যে সীমা থাকিবে না,—সে যে বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মদ্রোহিতা হইবে! সমগ্র জাতি এখন কাজ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, নগণ্য লোকও আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য ব্রতী হইয়াছে, এই সময়ে যদি একবার জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায়,—অবিশ্বাসের অন্ধকারের অতীত করিয়া জনসমাজের হৃদয়ে ধ্রুব ও স্নিগ্ধ জ্যোতির মত প্রকাশ করা যায়—আপদের সময় যদি জলন্ত উৎসাহের বাণী প্রচারিত হয়, সন্দেহের সময়ে যদি সত্যের পথ প্রদর্শিত হয়,—তবেই ত সাহিত্যের আসল সার্থকতা, তবেই ত দার্শনিক ও ঐতিহাসিকের সাধনা সফল।

যুদ্ধ ও সাহিত্য

একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধের সময়ে একটা মহনীয় সাহিত্যের প্রকাশ ইতিহাসে অনেকবার দেখা গিয়াছে। গ্রীস যখন ডেরিয়াসের বিরাট্ সৈনাকে প্রতিরোধ করিতেছিল, তখনই গ্রীক-সাহিত্যের প্রথম উন্মেষ। ইংলণ্ডের সহিত স্পেনের জলযুদ্ধ, ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লব ও সেই বিপ্লব-প্রসূত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ, আমেরিকার দাসত্ব-প্রথা-বিরোধী যুদ্ধ অথবা জার্ম্মানীর স্বাধীনতার যুদ্ধ (War of Liberation), জার্ম্মানীর ও ফ্রান্সের—১৮৭১ সালের যুদ্ধ প্রত্যেকেই সাহিত্য ও চিন্তার ভাণ্ডারকে নব নব উপকরণে সাজাইয়া বিশ্ব-সাহিত্যকে গরীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছে।

বর্ত্তমান মহাসমর যে অভিনব সুন্দর সাহিত্যের সৃষ্টি করিবে, তাহার সূচনা আমরা ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছি। কিন্তু আপাততঃ যাহা দেখা গিয়াছে, তাহাকে আমরা উদ্যোগ-পর্ব্ব ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না।

বর্ব্বর কে ?

আপাততঃ সাহিত্যিকগণের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছে,—স্বজাতি ন্যায়-যুদ্ধ করিতেছে, ও শত্রু অন্যায়-যুদ্ধ করিতেছে—ইহা প্রমাণ করা ; স্বজাতি সভ্যতার মুখ উজ্জ্বল করিবে এবং শত্রু জগৎকে বর্ব্বরতার অন্ধকারে পুনরায় লইয়া যাইবে—ইহা প্রচার করা।

বাস্তবিক কে সভ্য এবং কে বর্ব্বর, তাহাই এখন তথা-কথিত সভ্য-জগতে প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়াছে। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে এসিয়া ও আফ্রিকা শুনিয়া আসিতেছিল, তাহারা যুগের পর যুগ ইউরোপীয়-দিগের নিকট সভ্যতার ক, খ, গ শিক্ষা করিবে। আজ এ কি বিড়ম্বনা! ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এখন তীব্র আলোচনা হইতেছে,—ইউরোপের মধ্যস্থলে না কি বর্ব্বর আছে, আর সে বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে জগৎকে

জোর করিয়া বর্ব্বর করিবে, এই স্পর্দ্ধা বিজ্ঞানের দিন-দুপুরে প্রচার করিয়াছে।

এসিয়ার বিস্ময়

এসিয়াবাসীর পক্ষে ইহা কিন্তু খুব নূতন কথা। এসিয়া তিন চার হাজার বৎসর ধরিয়া ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে কত অভিনয় দেখিয়াছে, এসিয়াবাসী আদিম সভ্যতার সাক্ষী হইয়া বিশ্বমানবকে কত লীলাখেলা খেলিতে দেখিয়াছে। চার হাজার বৎসর জীবনযাপনের পর এসিয়াবাসীকে অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত শুনিতে হইয়াছিল—সে আদিম, তবুও সে অর্ব্বাচীন। ইউরোপ নবীন হইলেও জ্ঞানে প্রবীণ। নবীন ইউরোপীয়ের নিকট তাহার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। এসিয়াবাসী আপনার অধ্যাত্ম-সাধনার দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম-জ্ঞান নিজে পাইয়া জগৎকে বিলাইয়াছে। শক্তি-মদমত্ত ইউরোপীয় তাহার নিকট জোর করিয়া গুরুগিরি করিতে আসিল, এ অপমান এসিয়াবাসী ভুলে নাই। রুশ-জাপান-যুদ্ধের পর ভাবুকপ্রবর দার্শনিক অকাকুরা ইউরোপীয়ের গুরুগিরির বিরুদ্ধে একবার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধের ক্ষীণকণ্ঠ আমাদের দেশ পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার স্বদেশ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে নাই। তাঁহার স্বদেশ পূর্ব্বেই ইউরোপীয়কে গুরুর পদে বরণ করিয়া লইয়াছে।

অকাকুরা ও অকুমা

তিনি এখন স্বর্গে। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই তিনি আপনাকে এসিয়ার আদর্শ ও সাধনা ত্যাগ করিতে দেখিয়াছিলেন। জাপান এখন ইউরোপীয় শিষ্য, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এখন সে ইউরোপীয় কূটনীতি অবলম্বন করিয়াছে। তাই কূটনীতিবিশারদ কাউণ্ট অকুমা নির্লজ্জভাবে কূটনীতির গুণগান করিয়া বলিয়াছেন,—"It is Japan's aim and ambition

to participate in all world movements towards noble deplomacy" কূটনীতি আবার সহনীয় হইল, তাহা আবার একজন এসিয়াবাসীর মুখে !

আজ যখন বর্ত্তমান ইউরোপে সভ্যতার নাম বর্ব্বরতা লইয়া কবির লড়াই, দার্শনিকের বিচার, ও রাষ্ট্রসচিবের বাদ প্রতিবাদ হইতেছে, তখন সুদূর জাপান হইতে কাউণ্ট অকুমা ইউরোপীয় সভ্যতা রক্ষা করিবার মহান্ উদ্দেশ্য প্রচার করিলেন। জাপান সভ্যতা রক্ষা করিবার জন্য এবং জগতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত (to support and protect the highest ideals of civilisation, even to the extent of dying for them)। অকুমা বলিয়াছেন,—Japan's relation to the present conflict is as a defender of the things that make for higher civilisation and a more permanent peace.

জাপানের প্রগল্ভতা

ইউরোপীয় সভ্যতা রক্ষা করিতে ইউরোপীয়েরা সমর্থ নহে, জাপান আজ সভ্যতা রক্ষা করিতে প্রাণ পণ করিল ! "অসভ্য জাপান," দশ পনের বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ইউরোপ যাহাকে বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা করিত—সেই আজ গুরু সাজিয়া বসিল এবং Deplomacy কূটনীতির অসহ্য প্রগল্ভতার সহিত তাহাই আবার জগতে প্রচার করিতে লাগিল। কূটনীতির কৈফিয়ৎ না দিলেই হইত।

ইংরাজ, জার্ম্মান, করাসী ও জাপানী যুদ্ধের দ্বারা জগতে চিরশান্তি আনিবেন, হিংসা ও হত্যার দ্বারা জগতে প্রেমের প্রতিষ্ঠা করিবেন, বর্ব্বরতার দ্বারা জগতে সভ্যতা রক্ষা করিবেন। খ্রীষ্টীয় ইউরোপ ও বৌদ্ধ জাপান শত্রুর শোণিত-তর্পণে জগৎকে পবিত্র করিতে চাহিতেছে। বিংশ

শতাব্দীতে খ্রীষ্ট ও বুদ্ধের নিকট নরবলি ভিন্ন প্রসাদ লাভের উপায় নাই। শুধু militant Christ, muscular christianity নহে, বৌদ্ধধর্ম্মও অনুরূপ পাশবিক বলের ধর্ম্ম হইল।

বিশ্বসভ্যতা ও বিশেষ সভ্যতা

ফলকথা যিনি যাহা বলুন না কেন, অয়কেন বলুন বা অকুমাই বলুন, কিপলিভ্ বলুন বা বাবেস বলুন, আমরা জানি, সভ্যতার পক্ষ লইয়া এ যুদ্ধে কেহই যুদ্ধ করিতেছেন না। সভ্যতার পক্ষ লইয়া কেহ কখনও যুদ্ধ করেও না। সভ্যতা এমন একটা জিনিষ নহে যাহার উপর কাহারও স্বত্বাধিকার হয়, একটা ভূমি, একটা দেশ, একটা সাম্রাজ্যের মত যাহাকে লইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা বিবাদ মামলা যুদ্ধ সংগ্রাম চলিতে পারে। সভ্যতার উপর কাহারও স্বত্ব জন্মে না; সভ্যতা আমার নহে, তোমার নহে, সভ্যতা ইংলণ্ডের নহে, জার্ম্মানীর নহে, পাশ্চাত্যের নহে, প্রাচ্যের নহে, সাদা জাতির নহে, কালো জাতির নহে, সভ্যতা—বিশিষ্ট দেশের বা বিশিষ্ট জাতির নহে, সভ্যতা - সর্ব্বজাতীয়, সার্ব্বজনীন। সভ্যতা এই বিশ্বের সমগ্র জনসমাজের গাত্রের উপর একটা সুন্দর আবরণ, সমগ্র জনসমাজকেই আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ অঙ্গাবরণ একরকম সূত্রে তৈয়ারী নহে, নানা রংয়ের নানারকম সূত্রে গ্রথিত হইয়া বিশ্বের এই অঙ্গাবরণটা পরম মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন সমাজ—এই বিচিত্র সূত্র-গ্রথিত অঙ্গাবরণের এক একটা সূত্র আপনার বিশিষ্ট সাধনার ফলে বুনিয়া তুলিয়াছে। এক একটা জাতির সাধনা সভ্যতা আচ্ছাদন-বস্ত্রের এক একটী সূত্র,—একটি ছিঁড়িয়া গেলে সভ্যতা-বস্ত্রের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্যের হানি হয়। এক এক জাতির সাধনা লোপ পাইলে সভ্যতার বৈচিত্র্যের ও সৌন্দর্য্যের লোপ সাধন হয়। জাতির সাধনা তখনই বিকাশ সাধন করিতে পারে, যখন সে নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বিবাদে কাহারও বাধা বিঘ্নের

সৃষ্টি না করিয়া, কাহারও সহিত বিবাদ না করিয়া আপনারই দিকে নজর রাখিতে পারে। একটা যুদ্ধ ছোটই হউক বা বড়ই হউক, শুধু যুদ্ধ নহে কূটনীতি, ছোট দুর্ব্বল জাতিকে ভয় দেখান চোখ রাঙ্গানি ইত্যাদি বিশিষ্ট জাতির সাধনার অন্তরায়। এক একটা যুদ্ধে অনেক সময়েই এক এক জাতির সাধনা বিনষ্ট হয়। সভ্যতাবরণের এক একটা সূত্র ছিঁড়িয়া যায়। ইহাতে ক্ষতি হয় শুধু সে জাতির নহে। সেই জাতির পক্ষে ইহা ত মৃত্যু। সভ্যতার পক্ষে ইহাতে বৈচিত্র্যহানি, সকল জাতিরই পক্ষে ইহাতে সৌন্দর্য্য-হানি। বস্ত্রের একটা সূত্র ছিঁড়িলে, সমগ্র বস্ত্র এবং বিশিষ্ট সূত্র সমুদয়ই একটু হীনবল হয়,—যুদ্ধের একের অভাবে তখন সকলই পূর্ব্বকার মত সুন্দর দেখায় না, ফলে একটা জাতির সাধনা বিনষ্ট হইলে সভ্যতা এবং সকল জাতির পক্ষেও তাহাই হয়।

সভ্যতায় গৃহ-বিবাদ

কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের সম্বন্ধে এসব কথা খাটে না। একপক্ষ বলিয়াছেন, এ যুদ্ধ প্রজাতন্ত্রের সহিত সেনাবলে বলীয়ান্ রাজশক্তির সঙ্ঘর্ষ; আর একপক্ষ বলিয়াছেন, অর্থ-প্রতিপত্তি-মূলক সমাজরীতির (Economisms) সহিত ইহা বিশুদ্ধ নীতি ও ধর্ম্মের যুদ্ধ। এ সব কোন কথাই ঠিক নহে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে কোন বিশিষ্ট সভ্যতার মধ্যে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। ইউরোপের বিভিন্ন জাতি ইতিহাসের ক্রমবিকাশের দ্বারা একই প্রকার সভ্যতার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। সমাজ-গঠনের দিক্ হইতে যদি আমরা দেখি, তাহা হইলে ইউরোপের বিভিন্ন জাতি যে সভ্যতার বিকাশসাধন করিয়াছে, তাহা গ্রীক, রোমীয় ও টিউটন জাতির বাষ্পীয় ও সামাজিক ক্রমবিকাশধারার ফল; ভাবসমূহের দিক্ হইতে যদি দেখি, তাহা হইলে তাহা হেলেনীয় সৌন্দর্য্যোপাসনা খৃষ্টান ধর্ম্ম ও বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের পরিণামভাবাত্মক সাধনার সম্মিলিত ফল। ইউরোপের সকল দেশই

অল্পাধিকভাবে গ্রীকরোমীয়-টিউটনের আদর্শ তাহাদের সমাজ ও রাষ্ট্র-গঠনে অবলম্বন করিয়াছে, ইউরোপের সকল জাতিরই ভাব-সাধনা হেলেনীয় সৌন্দর্য্যমূলক ভাবুকতা, খৃষ্টাননীতি ও আধুনিক বিজ্ঞানের লীলাত্মক ধর্ম্মের ফল। সমাজ-গঠন ও ভাবসাধনার দিক্ হইতে ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মধ্যে একটা মৌলিক ঐক্য আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বিশ্বমানবের অঙ্গাবরণের একটি সূত্র ইউরোপের বিভিন্ন জাতি ইতিহাসের ক্রমবিকাশের দ্বারা বুনিয়া তুলিয়াছে—তাহা বড় সুন্দর, বড় বিচিত্র, তাহার অভাবে সমগ্র বিশ্বমানবের অমঙ্গল, বিশ্বসভ্যতার সৌন্দর্য্য হানি ঘটিবেই ঘটিবে।

ইউরোপীয় সভ্যতার বিশিষ্টতা

আজ এই যুদ্ধে আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার সেই বিশিষ্টতার বিলোপের সূচনা দেখিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইউরোপীয় সভ্যতা তিনটি ভাবধারায় গঠিত। এই তিনটি বিক্ষিপ্ত এবং বিরোধী ভাবগুলিকে পরস্পর সম্বদ্ধ রাখিয়া ইউরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা ও তাহার বিশিষ্টতার বিকাশ সাধন করিয়া আসিতেছিল। এই যুদ্ধে এই তিনটিই আদর্শ রক্ষা হিসাবে যে কত দুর্ব্বল, তাহার প্রমাণ আমরা পাইতেছি।

গ্রীকের সৌন্দর্য্যোপাসনা

প্রথম আমরা হেলেনিজম বা গ্রীকসাধনাপ্রসূত সৌন্দর্য্যমূলক ভাবুকতার কথা ধরি। প্রকৃতিরাজ্যের শৃঙ্খলা মানুষের মনে সৌন্দর্য্যের জ্ঞান জাগাইয়া দেয়, অনন্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে একটা অবিচলিত ভাববাক্য গঠন করে; ব্যক্তির বিক্ষিপ্ত ও উচ্ছৃঙ্খল ভাবগুলিকে দমন করিয়া তাহাকে শাসনের বশে আনয়ন করে। সমাজের নিয়মের ভিতর থাকিয়া ব্যক্তি তখন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহার জীবন

তখন তাহার নিকট পরম সত্য, পরম আনন্দময় হয়। প্রকৃতি-রাজ্যে শৃঙ্খলাই সৌন্দর্য্যের উপাদান, মনুষ্যের অন্তরে জ্ঞানকেই শৃঙ্খলা বা নিয়মের সৃষ্টি করিয়া অন্তরকে সৌন্দর্য্য ও আনন্দে উদ্ভাসিত করিয়া দেয়। ইহাই হইতেছে, গ্রীক জীবনের মূল-তত্ত্ব।

খ্রীষ্টান-ধর্ম্মের অতীন্দ্রিয়বাদ

কিন্তু মানুষের অন্তরে অতৃপ্তি যায় না। সে প্রশ্ন করে, সন্দেহ করে, অবিশ্বাস করে,—এই অপরোক্ষ ইন্দ্রিয়রাজ্যকে সে পরম সত্য বলিয়া কিছুতেই মানিতে পারে না, তাহাকেই পরম সুন্দর ও আনন্দময় বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না, "অন্তরে তার বৈরাগী গায়—তাইরে নারে নাইরে না"। খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রীক সভ্যতার অন্তরে—এই বৈরাগী হইয়া আসিল। ভাবরাজ্যে অমনি একটা তোলপাড় হইয়া গেল। খৃষ্টান-ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়রাজ্যকে একবারেই পরিত্যাগ করিয়া বসিল। ইউরোপীয় জীবনে সরল জ্বলন্ত প্রেমের প্রতিষ্ঠা হইল, একটা ব্যাকুলতা আসিল, একটা নিবিড় অনুভূতি আসিল, একটা ভাবুকতার বন্যায় অপরোক্ষবাদ সমস্ত ভাসিয়া গেল।

খৃষ্টান-ধর্ম্ম ও সমাজের বিরোধ

কিন্তু খৃষ্টান-ধর্ম্ম যে ভাবুকতার সৃষ্টি করিল, তাহার সহিত বাস্তবের বিশেষ সমন্বয় সাধিত হয় নাই। একটা নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইল বটে, সেখানে অনন্ত প্রেম, অনন্ত ত্যাগ, কিন্তু এই বাস্তব জগৎকে সে প্রেম সে ত্যাগ পবিত্র করিতে পারিল না। একটা ধারণা জাগিয়া উঠিল যে, খৃষ্টান-ধর্ম্ম এ জগতের জন্য নহে, এ সংসারের লোকেদের জন্য নহে; এ সমাজে, সমাজের কাজকর্ম্ম অনুষ্ঠানের মধ্যে খৃষ্টান-ধর্ম্ম অবলম্বন করা সম্ভবপর নহে, এমন কি অনিষ্টজনক। খৃষ্টান-ধর্ম্ম ব্যক্তিগত খৃষ্টানের সংকীর্ণ কাজকর্ম্ম, চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যেই আবদ্ধ। ব্যক্তির চিন্তা ও কল্পনার ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া খৃষ্টান-ধর্ম্ম যদি ব্যবসায়, বা অন্তর্জ্জাতীয়

ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। এক গালে চড় খাইলে আর এক গাল পাতিয়া দেওয়া কোন ব্যক্তির পক্ষে নেহাৎ অসম্ভব কল্পনা নহে, কিন্তু জাতির পক্ষে তাহাই আত্মঘাত। খৃষ্টান-ধর্ম্মের সহিত খৃষ্টানের জীবনের একটা বিরোধ, একটা অসামঞ্জস্য ক্রমশঃ—বাড়িয়াই উঠিতেছিল।

খৃষ্টান-ধর্ম্ম সম্বন্ধে মোটামুটি একটা কথা বলা যায় যে, ইহার আসল ভিতরকার প্রাণ হইতেছে, অতীন্দ্রিয়ের তুরীয়ের নিকট সম্পূর্ণভাবে শিশুর মত সরল আত্ম-সমর্পণ। খৃষ্টান-ধর্ম্ম একটা আসল পরোক্ষবাদ। খৃষ্টান-ধর্ম্ম যদিও এই ইন্দ্রিয়জগৎকে একবারে ছাড়িয়া বসে নাই, কিন্তু তাহার মুখের উপর জোরের সহিত সে ইহা স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে, যে তাহাতে জীবন আবদ্ধ রাখা আধ্যাত্মিক মৃত্যু।

কিন্তু ইউরোপীয় সমাজ বর্ত্তমান প্রত্যক্ষের মধ্যেই তাহার জীবনের আদর্শকে আবদ্ধ রাখিয়া এই আধ্যাত্মিক মৃত্যুকেই বরণ করিয়াছে। খৃষ্টান-ধর্ম্মের সহিত গ্রীক, রোমীয়, টিউটনের আদর্শের ক্রমবিকাশলব্ধ সমাজরীতিনীতির একটা অত্যন্ত বিরোধ ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। খৃষ্টান-ভাব-সম্পদের সহিত ইউরোপীয় সমাজজীবনের একটা অভ্যন্তরীণ বিরোধ বহুকাল হইতে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া এক্ষণে অত্যন্ত তুমুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গ্রীক-রোমীয়-টিউটন-সমাজনীতি

গ্রীক-রোমীয়-টিউটন আদর্শের ক্রমবিকাশফলে সমাজ যে আকার গ্রহণ করিয়াছে, এক কথায় তাহার নাম বলি, Social Democracy.

ইহার প্রধান সূত্র হইতেছে—

(ক) শ্রমজীবিগণের ভাব ও আদর্শের দ্বারা সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত করা।

(খ) অর্থমূলক বৈষয়িক ব্যাপারকে সমাজের একমাত্র লক্ষ্য করা।

দুইটী সূত্র সম্মিলিত হইয়া Socialism সমাজ-তন্ত্রের নীতি হইয়াছে,— শ্রমজীবিগণের হিতসাধনের জন্য একটা বৈষয়িক ক্ষেত্রে বিপ্লব আনিয়া শ্রমজীবিগণের আকাঙ্ক্ষায় সমাজকে পরিচালিত করা।

গ্রীকসভ্যতা ইউরোপকে প্রজাতন্ত্র দান করিয়াছে। কিন্তু গ্রীক প্রজাতন্ত্র কখনই শ্রমজীবী শিল্পী ব্যবসায়ীর আদর্শে পরিচালিত হয় নাই। গ্রীকের সৌন্দর্য্যপূজার নিকট বৈষয়িক আদর্শ একবারে নিষ্প্রভ হইয়াছিল। তাহার পর খৃষ্টান-ধর্ম্ম বৈষয়িক আদর্শকে সমাজে একবারে হীন করিয়া দিল। রোমীয় আদর্শ ব্যক্তিগত স্বত্বের উপর অত্যন্ত অধিক ঝোঁক দিয়া ইউরোপীয় সভ্যতাকে বিপথে প্রেরণ করিল এবং শেষে বিলাসিতার স্রোতে হাবুডুবু খাইতে খাইতে একটা প্রাণহীন নাস্তিকতার অতলে ডুবিয়া গেল। খৃষ্টান-ধর্ম্ম ইহার মধ্যে নিতান্ত একটা খাপছাড়া জিনিস হইয়াছিল। তাহার পর মধ্যযুগে খৃষ্টানবিহার সমুদয় সমাজে বৈরাগ্যের আদর্শকে সজীব রাখিয়াছিল। সেই সময় বৈষয়িক ব্যাপারকে ইউরোপ অত্যন্ত হীন চক্ষেই দেখিয়াছিল।

সাম্যতন্ত্রে বৈষয়িক আদর্শ

ইহার পরই রেনেসাঁ (Renaessance) নব জাগরণ। বৈষয়িক ব্যাপার সমাজে আবার প্রতিষ্ঠালাভ করিতে লাগিল। ফ্লোরেন্স, ভেনিস প্রভৃতি ইতালীর নগরে নূতন শিল্প ও ব্যবসায়-প্রণালী ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসীরাষ্ট্রের মূল আদর্শ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। ইউরোপীয় জাতিসমূহের চিন্তাকেন্দ্রে বৈষয়িক আদর্শ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং যখন আডাম স্মিথ প্রচার করিলেন, বৈষয়িক উন্নতি সভ্য জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, জগতের সমস্ত জাতির মধ্যেই বৈষয়িক ব্যাপারই বিজ্ঞান, আর্ট, শিক্ষা এমন কি, নীতি

ও ধর্ম্মেরও সত্তা প্রদান করিতেছে, তখন সমগ্র ইউরোপ ভাবিল, আডাম স্মিথ তাহারই প্রাণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি মানুষকে ক্রমশঃ আধ্যাত্মজগৎ হইতে দূরে আনিয়া বাস্তবের মধ্যে আবদ্ধ করিতে লাগিল। এমন কি, দর্শনও বাহিরের ইন্দ্রিয়জগৎ হইতে অন্তর্জ্জগতের ব্যাপারসমূহ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া হিতসাধন-মূলক তথ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস্তবকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিল।

সামাজিক সাম্যবাদ

এই সকল ভাব পরস্পর কর্ত্তৃক পুষ্ট হইয়া ইউরোপীয় সমাজে বৈষয়িক উন্নতির আদর্শের (Economism) প্রতিষ্ঠা করিল। খৃষ্টান-ধর্ম্মের বৈরাগ্যের আদর্শের সহিত এই বৈষয়িক আদর্শের আকাশ পাতাল প্রভেদ। এদিকে গ্রীক ও টিউটনের আদর্শানুযায়ী প্রজাতন্ত্রের ভাব ইউরোপীয় সমাজে বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়া আসিতেছিল। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সাম্য মৈত্রী, স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রজাতন্ত্রের ভাবকে ধর্ম্মের মত হৃদয়ের অনুভূতির মত বরণ করিয়া লইল। প্রজাতন্ত্র এখন নূতন আকার গ্রহণ করিল। ইহা গ্রীক অথবা টিউটনের Democracy নহে, ইহা আরও ব্যাপক, প্রশস্ত।

ইহা হইল Social Democracy সামাজিক সাম্য-তন্ত্র। ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত এই নূতন প্রজাতন্ত্র সম-সময়ের বৈষয়িক উন্নতির আদর্শকে চরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া সমাজ-তন্ত্রের (Socialism) সৃষ্টি করিল। Social Democracy ও Economismএর সম্মিলিত ফল Socialism.

বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার অন্তরতম প্রাণ কোথায়—জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, এই Social democracy এবং ইহার ফললব্ধ Socialismএর ভিতরই তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, অন্য কোথায়ও না।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী সকলেই সামাজিক সাম্য-তন্ত্রকেই সমানভাবে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সামাজিক সাম্যতন্ত্র ইউরোপের এক জাতির সম্পত্তি নহে, ইহা ইউরোপের সর্ব্বজাতীয়, সার্ব্বজনীন। ইউরোপ পৃথিবীর যেখানেই তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সেইখানেই তাহার সামাজিক সাম্যতন্ত্রের ভাব ও আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে। সামাজিক সাম্য-তন্ত্র হইতেই ইউরোপীয় সভ্যতা। ইউরোপ হইতেই সামাজিক সাম্যতন্ত্র।

সামাজিক সাম্য-তন্ত্রের আদর্শ—যাহা ইউরোপের বিশেষত্ব, তাহা হইতে ইউরোপ এখন কিরূপে বিচ্যুত হইতেছে, উহা আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

পাশ্চাত্য চিন্তায় অবসাদ

জবরদস্ত খৃষ্টান

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, খৃষ্টানধর্ম্ম ইউরোপীয় সমাজে একটা খাপছাড়া জিনিষ। মধ্যযুগে খৃষ্টানধর্ম্মের সহিত সমাজের একটা সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু শেষে কিছু পরেই দেখা গেল, খৃষ্টানধর্ম্ম এই সংসারকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া দৈনন্দিন জীবনের উন্নতির অন্তরায় হইল, এবং পুরোহিতদিগের একটা সঙ্কীর্ণ ভাবরাজ্যের সহিত সমগ্র সমাজের চিন্তার আদান প্রদান বন্ধ করিয়া জনসাধারণের আধ্যাত্মিক বিকাশেরও অন্তরায় হইয়াছিল। খৃষ্টান ভাবসম্পদের সহিত ইউরোপীয় জাতিসমূহের চিন্তাধারার ক্রমাগতই একটা বিরোধ সৃষ্টি হইতে চলিয়াছিল। শেষে খৃষ্টানধর্ম্ম এক্ষণে এমন একটা জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ইউরোপের সকল জাতিই বর্ত্তমান যুদ্ধে খৃষ্টের নাম লইয়া পরস্পরকে হত্যা করিতে অগ্রসর। ইউরোপীয় সভ্যতাকে এখন খৃষ্টীয় সভ্যতা কিছুতেই বলা যায় না। খৃষ্ট এখন Tribal Godএ পরিণত হইয়াছেন, প্রত্যেক জাতি আপনার খৃষ্টের নিকট শত্রুপক্ষকে বলি প্রদান করিতেছে। সভ্যতার গুণই হইতেছে, সে বিরোধ নিবারণ করে, বিরোধের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করে। খৃষ্টানধর্ম্ম কখনই ইউরোপীয় সভ্যতার অঙ্গ নহে, তাহা হইলে সে এই অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিবারণ করিতে পারিত, তাহা হইলে খৃষ্টের নামে, খৃষ্টেরই জয় গান করিয়া বিভিন্ন জাতি স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বিনাশ করিতে তৎপর হইত না। ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, শান্তির দেবতা আজ ইউরোপের হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত নহেন,—Moloch Beelzebub প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির নিকট দেবতার পদে অধিষ্ঠিত হইতে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রকে অপমান করিতেছেন, শান্তিকে সুদূরপরাহত করিয়াছেন।

তাই বলিতেছি, খৃষ্টধর্ম্মে নহে, সামাজিক সাম্যতন্ত্রেই বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণকে খুঁজিয়া পাইব। বর্ত্তমান যুদ্ধে ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্মের আদর্শের শোচনীয় দৌর্ব্বল্যের প্রমাণ পাওয়া গেল। সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে যদি ইউরোপ আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, তবে বিশ্ববাসীর নিকট সে কখনই আর খৃষ্টীয় সভ্যতার বড়াই করিতে পারিবে না।

প্রজাতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র

ইউরোপীয় সভ্যতার এক অঙ্গ পড়িয়া গেল। আর এক অঙ্গও অসাড় হইয়া পড়িতেছে। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতাবাদ সমগ্র ইউরোপময় প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইয়াছিল, সেনাবলের দ্বারা; ফরাসীজাতি ইউরোপ বিজয়ের দ্বারা ইউরোপে সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিল। ইতিহাস সেনাবলের আয়োজন ব্যর্থ করিল বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য সফল করিয়া দিল। পাশ্চাত্য ইউরোপে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রজাতন্ত্র বৈষয়িক ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব আনিয়া সাম্যনীতিমূলক ব্যবসায়তন্ত্র আনয়ন করিতে চেষ্টা করিল। আবার সেই ফরাসীবিপ্লবের নেতাদিগের মত জোর করিয়া সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন! এবার নেতা হইলেন কার্‌ল মার্ক্‌স ও ফ্রেডারিক ল্যাসেল। সামাজিক বিপ্লবের দ্বারা সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল না। সমাজতন্ত্রের প্রধান পুরোহিত কার্‌ল মার্ক্‌স অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রের ভাব ও আদর্শ ক্রমশঃ ইউরোপময় ব্যাপ্ত হইল।

অনেক আজগুবি কল্পনা ইউরোপীয় চিন্তাজগতে স্থান পাইল। দেশের সমস্ত ধন সম্পত্তি কেহ সমান ভাবে সকল লোকের মধ্যে ভাগ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন, কেহ লোকের অভাব অনুসারে, কেহ বা লোকের কার্য্যকুশলতা অনুসারে ভাগ বাটোয়ারা করিবার প্রস্তাব লইয়া খুব তর্ক বিতর্ক হট্ট গোল আরম্ভ করিয়া দিলেন। সকল দলই ধনীর

ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইয়া গরীবকে অভাবের তাড়ন হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইলেন। সকল দেশেরই প্রজাতন্ত্র গরীব শ্রমজীবিগণের কল্যাণে বৈষয়িক আইন কানুন তৈয়ারী করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর আধুনিক কালের আইন কানুন সবই সমাজতন্ত্রের আদর্শে তৈয়ারী। জনসমাজ এখন রাষ্ট্রে সর্ব্বশক্তিমান্, সে কত কাল-অর্দ্ধাশনে অনশনে থাকিবে ?—"a penniless omnipotence is an unsupportable presence" তাই প্রজাতন্ত্র এখন বিপ্লব প্রবর্ত্তন করিয়া সমাজের ঐশ্বর্য্য ভাগ বাটোয়ারা করিতে বদ্ধপরিকর।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণীর সমাজ-তন্ত্র

ইংলণ্ডে ভূম্যাধিকারীদিগের সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিপত্তি এখনও রহিয়াছে, তাহা ছাড়া ইউরোপের অন্যদেশ অপেক্ষা ইংলণ্ড এখনও রাষ্ট্রকে সর্ব্বশক্তিমান্ করিয়া তুলে নাই, রাষ্ট্রকে সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার এখনও দেয় নাই, তাই ইংলণ্ডে সমাজতন্ত্র প্রবর্ত্তন করিবার ভার পড়িয়াছে, রাষ্ট্রের উপর নহে, শ্রমজীবি-সঙ্ঘের (Syndicalism) উপর। ফ্রান্সেও তাই। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে ব্যক্তিসর্ব্বস্ব দর্শনবাদের ফলে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্রমবিকাশের ফলে, রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া নহে, শ্রমজীবিসঙ্ঘের ভিতর দিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। জার্ম্মাণীতে কিন্তু তাহা নহে। ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ফলে জার্ম্মাণীতে জনসমাজ রাষ্ট্রকেই সর্ব্বশক্তিমান্ করিয়া তুলিয়াছে। রাষ্ট্রই সেখানে হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা,—শুধু বুদ্ধিতে নহে, অনুভূতিতে। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সেখানে ইহাই একমাত্র উপদেশ। রাষ্ট্রই সেখানে জনসমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিরূপ হইয়া সমাজতন্ত্র স্থাপনে প্রয়াসী। ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের মত ব্যক্তি বা শ্রমজীবিসঙ্ঘ সেখানে হৈ চৈ করিয়া, দরজা ভাঙ্গিয়া, বাড়ী ভাঙ্গিয়া, তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়া আপনাদের স্বত্ব বজায় রাখিতে তৎপর

নহে। সেখানে কলের মত কাজ চলে, দল পাকাইয়া স্বত্ব আদায় করিবার জন্য চীৎকারের প্রয়োজন নাই, রাষ্ট্রই সেখানে ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিরোধ করিয়া তাহাকে নীরবে, নির্ব্বিবাদে আপনার স্বত্ব ভোগ করিবার অধিকার দিতেছে।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রের দোষ হইয়াছে বিরোধ ও উচ্ছৃঙ্খলতা; জার্ম্মাণীর সমাজতন্ত্রের দোষ হইতেছে যে, ইহা একটা কলের মত প্রাণহীন অন্তঃসারশূন্য। ব্যক্তিসর্ব্বস্ব দর্শনবাদের ফলে হইয়াছে আত্মকেন্দ্রতা, আত্মসর্ব্বস্বতা; সমষ্টিপ্রধান দর্শনের ফলে ক্যাটিগরী; ও য়্যাব্‌সলিউটের প্রভাবে অপর পক্ষে হইয়াছে, আত্মবিলোপ।

সে যাহাই হউক, আসল কথা হইতেছে—এই সমাজতন্ত্রই ইউরোপীয় সভ্যতার অন্তরতম প্রাণ।

সাম্য-তন্ত্রের শত্রু সাম্রাজ্যনীতি

সমাজতন্ত্রের ভাব ও আদর্শ বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান নৈতিক শক্তি হইয়াছিল, ইহা বলিলে ভুল হইবে না। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ ইহা প্রমাণ করিয়া দিল—ইউরোপীয় জাতিসমূহ সমাজতন্ত্রের প্রতি কত উদাসীন, সমাজতন্ত্রের আদর্শ কত মলিন। কার্‌ল মার্কস ও ল্যাসেল আশা করিয়াছিলেন, বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবিগণ সমাজতন্ত্রের ভাব ও আদর্শে পরিচালিত হইয়া ঐক্যসূত্রে সম্বদ্ধ হইবে, তখন ইউরোপে যুদ্ধবিগ্রহ অসম্ভব হইবে। খৃষ্টানধর্ম্ম ইউরোপীয় জাতিসমূহকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিল না। সমাজতন্ত্রের আদর্শ ছিল ঐক্য সংস্থাপন, তাহাও হইল না। এখন আমরা দেখিতেছি, জার্ম্মাণীতে সমাজতন্ত্রের ধুরন্ধরগণ, যাঁহারা থিয়রিতে এক চুল তফাৎ লইয়া কত বাগ্‌বিতণ্ডা করেন, আজ তাঁহারা জার্ম্মাণীর সমরসচিবকে অজস্র টাকা দিতে উৎসুক। বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রের নেতাগণ যাঁহারা

ইউরোপব্যাপা একটা বিরাট্ শ্রমজীবিসঙ্ঘ গঠন করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে কত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এখন অন্তর্জ্জাতীয় সখ্য ছাড়িয়া পরস্পরকে হত্যা করিতেছেন। আসল কথা হইতেছে, সমাজতন্ত্রবাদের শত্রু হইয়াছে অন্য দেশের রাষ্ট্রশক্তি বা সেনাবল নহে; নিজ দেশের অন্তঃস্থলে সাম্য-তন্ত্রের বিরোধী যে একটা ধন অথবা শিক্ষাভিমানী, ব্যবসায় বা রাষ্ট্রীয় জগতে প্রতিপত্তিশালী দলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। তাহাই, সমাজতন্ত্রের আদর্শের লোপসাধন করিয়া যে আন্দোলন সমগ্র ইউরোপময় ব্যাপ্ত হইয়া অন্তর্জ্জাতীয় সম্বন্ধে নূতন ভাব আনিতেছিল, তাহাকে অচিরেই নষ্ট করিয়া দিল। সমাজতন্ত্রের শত্রু হইয়াছে শুধু প্রুসিয়ার সেনাশক্তি নহে, রুশিয়ারও প্রজা-বিরোধী রাজতন্ত্র; শুধু অষ্ট্রিয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নহে, সকল যুধ্যমান জাতিরই সাম্রাজ্যনীতি। এই সাম্রাজ্য-নীতি, যাহা দুর্ব্বলজাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ সাধন করিতে সতত জাগরিত, যাহা নিজের স্বার্থসিদ্ধি ভিন্ন অপরের অভাব ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি দৃক্‌পাতও করে না, অন্য জাতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া আপনার শক্তি অনুভব করিবার এই তৃষ্ণা, ইহাই সামাজিক সাম্যতন্ত্রের প্রধান শত্রু হইয়াছে। বাহিরের শত্রু ত রহিয়াছেই, কিন্তু আসল শত্রু হইয়াছে স্বসমাজের অন্তরে যে ভোগস্পৃহা—উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, যাহা পরজাতির ধনৈশ্বর্য্য ভাবসম্পদ্ আপনার ভোগ্যরূপে পরিণত না করিতে পারিলে নিবৃত্ত নহে। তাহাই প্রজাতন্ত্রকে দুর্ব্বল, সমাজতন্ত্রকে বিপর্য্যস্ত ও বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতাকে আত্মদ্রোহী করিয়াছে, এবং তাহাই বিশ্ব-সভ্যতার মধ্যে চরম অমঙ্গলের সূচনা করিয়াছে। আগেই বলিয়াছি, বিশ্বসভ্যতা জগতের যাবতীয় জাতির মহনীয় ভাবসম্পদে গৌরবান্বিত। এক ভাব-সম্পদ্ নষ্ট হইলে বিশ্বসভ্যতার বৈচিত্র্য ও গৌরবহানি। যে জাতি পরজাতির ভাবসম্পদ্ আত্মসাৎ করিতে প্রয়াসী, সে সভ্যতার শত্রু, সে-ই আসল বর্ব্বর,—ধর্ম্মের নামে হউক, বিজ্ঞানের নামে হউক বা সভ্যতার

নামে হউক, সে তাহা করিতে চাহিলে, সে-ই বিশ্বসভ্যতার দরবারে আসল তস্কর ও দস্যুর মত বিচারপ্রার্থী।

সাম্রাজ্যনীতি ও ইউরোপীয় সভ্যতার পরিণাম

ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণের পুত্তলি, সেই সাম্যনীতিমূলক সমাজতন্ত্রকে ভোগতৃষ্ণা-রাক্ষস সম্রাজ্যনীতি গ্রাস করিয়া ফেলিল। তাহা শুধু ইউরোপের বিভিন্ন জাতির নহে, গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া সমগ্র জগতের মনুষ্যত্বকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই যুদ্ধে যদি সেই রাক্ষসের বিনাশ সাধন হয়, তবে ইউরোপ ও জগৎবাসীর পক্ষে মঙ্গল।

আমরা গ্রীক-রোমীয়-টিউটন আদর্শের সমাজগঠনের ক্রমবিকাশলব্ধ সামাজিক সাম্যতন্ত্রের পরিণাম দেখিলাম। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজতন্ত্র-বাদের আশাকে নির্ম্মূল হইতে দেখিলাম। আবার ভাবের ক্রমবিকাশের দিক্ হইতে গ্রীকের সৌন্দর্য্যমূলক ভাবুকতা ও খৃষ্টাননীতিরও বিলোপ সাধন দেখিলাম। ইউরোপীয় সভ্যতার বিশিষ্টতাই এখন নষ্ট হইল দেখিলাম।

নৈরাশ্য

ইউরোপীয় সভ্যতার অন্তরতম হৃদয় হইতে এমন একটা বিফলতা ও নৈরাশ্যের করুণ বিলাপ শুনা যাইতেছে, যাহা জগতের ইতিহাসে বোধ হয় কখনও শুনা যায় নাই। যে সকল আদর্শ ইউরোপের ইতিহাসের বিপুল প্রয়াসের মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশমান, তাহারা যে অন্তঃসারশূন্য প্রমাণিত হইল, ইহা জগতে একটা প্রকাণ্ড ট্র্যাজেডি, সন্দেহ নাই।

হিন্দুসভ্যতা ও পাশ্চাত্য আদর্শ

কিন্তু এই সকল আদর্শ যে বাস্তবিকই অন্তঃসারশূন্য, তাহারা যে সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ববিকাশের অন্তরায়, তাহা এত কাল ধরিয়া ইউরোপ যে

বুঝিতে পারে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। প্রাচ্য জগতের নিকট এই সকল আদর্শের দোষ আপনিই ধরা পড়ে।

সাম্যতন্ত্রে স্থূলভাব ও আদর্শ

প্রথমতঃ ইউরোপের গ্রীক-রোমীয়-টিউটনের ক্রমবিকসিত সাধনালব্ধ সমাজ-জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে বলি। হিন্দুসভ্যতা এই আদর্শকে কি ভাবে বিচার করে, তাহাই বলিব।

সাম্যতন্ত্র সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ববিকাশের অন্তরায়, কারণ সাম্যতন্ত্র সকল মানুষকে সমান ভাবে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিরোধ করে; সাম্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা স্থূলভাবাপন্ন মানুষের আদর্শকল্পনার উপর। হিন্দুসভ্যতা সাম্যতন্ত্রের আদর্শকে অস্বীকার করে। হিন্দুসভ্যতা সাম্যকে স্বীকার করে সেই ক্ষেত্রে, যেখানে মানুষ স্থূলভাবের উচ্চে উঠিয়া অধ্যাত্ম-জগতে ঐক্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। সাম্যতন্ত্র স্থূলভাবের প্রতিষ্ঠা করে, সমাজকে অন্তঃসারশূন্য সমতার আদর্শে গঠন করিয়া প্রকৃত অধ্যাত্ম উপলব্ধির আদর্শকে হীন করে। সাম্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অধ্যাত্মজ্ঞান-বিকাশের অন্তরায়। হিন্দুসভ্যতা পাশ্চাত্য জগতের সাম্যতন্ত্রের আদর্শকে কখনই বরণ করিতে ইচ্ছুক নহে। সাম্যতন্ত্র যে স্থূল ভাব-সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার প্রমাণ সাম্য-তন্ত্রের বৈষয়িক উন্নতিকে চরমলক্ষ, বলিয়া অবলম্বন (Economism)। ইউরোপীয় সাম্যতন্ত্র জনসাধারণকে রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রদান করিয়াছে; জনসাধারণ ভাবিয়াছে, তাহারা আপনাদের যাবতীয় অভাব মোচন করিতে পারিলেই সর্ব্বাঙ্গীণ সুখলাভ করিতে পারিবে; সুতরাং রাষ্ট্র এখন বৈষয়িক উন্নতি সাধনের চরম লক্ষ্য মনে করিয়া সমাজ জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ইহার ফলে রাষ্ট্রশক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতিরোধ হইতেছে, অপরদিকে মানুষের আসল জ্ঞান ও অধ্যাত্ম সত্যের অনুভূতিশক্তি

কমিয়া আসিতেছে, দৈহিক অভাব মোচনের সুখকে পরম সুখ বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, অথচ আসল সুখ কেহই ভোগ করিতে পারিতেছে না,—অভাব মোচনেও সুখ হইতেছে না ; কারণ রক্তবীজের মত নূতন নূতন অভাব সৃষ্ট হইয়া মানুষের সুখানুসন্ধানের চেষ্টাকে নিয়ত ব্যাপৃত রাখিতেছে।

আমার জন্য সভ্যতা

সভ্যতাই যে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধির জন্যই, ইউরোপের ইহা অন্তরের কথা। আমার জন্যই যে সভ্যতা, সভ্যতার বিকাশ যে আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের ক্রম, ইহা ইউরোপের ভিতরের কথা। ইউরোপের দর্শনের খাঁটি কথা হইতেছে—আগে আমি, তাহার পর জগৎ। পুরাতন Epicureanism হইতে বর্ত্তমান utilitarianism পর্যান্ত, সেই এক কথা—আগে আমার সুখ, তাহার পর জগতের। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্। এমন কি, ভাবাত্মক দর্শনেও সেই আমিরই প্রতিপত্তি। যেমন ফিক্‌টে বলিয়াছিলেন—এ জগৎটাই কিছুই নহে, শুধু একটা কল্পনা, কিছুই নাই, শুধু এই অনন্ত ক্রমবিকাশমান আমি। সেলিঙ তাহা উল্টাইয়া বলিলেন—জগৎটা কল্পনা নহে, জগৎ সত্য, কিন্তু ইহার আত্মা হইতেছে আমি যে আমি আমার অন্তরে, সেই আমিরই জ্ঞানে জগৎ প্রতিভাত।

এই আমিপ্রধান চিন্তা অনেক সময়ে অনেক বিরোধের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করে, একটা সোজাসুজি কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দেয়, কিন্তু তাহা কখনও নূতন জীবন দিতে পারে না, সভ্যতার অন্তরে একটা নূতন শক্তি জাগাইয়া দিতে পারে না। তাই ইউরোপেও আমি-সর্ব্বস্ব দর্শনের বিরোধী দর্শনেরও সৃষ্টি হইয়াছে।

সভ্যতার জন্য আমি

স্পাইনোজা বিশ্বানুপ্রবিষ্ট আত্মার কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাত্মার কল্পনায় 'আমি' একবারেই অন্তর্হিত। 'আমি' সেখানে জড়ের

মত নিষ্ক্রিয়। হেগেলের বিশ্বদর্শন এই দিক্‌কার চূড়ান্ত কথা। বিশ্বজগৎ সেই পরমজ্ঞানময় পুরুষের জ্ঞানে প্রতিভাত। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস সেই জ্ঞানের বিকাশ। হেগেলের চিন্তা তাঁহার দর্শন ছাড়িয়া নানা দিক্‌ হইতে ইউরোপের ভাব নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। বর্ত্তমান জীবনের নানা দুঃখ, ক্লেশ, আশঙ্কা, কর্ত্তব্য-বিমূঢ়তার মধ্যে লোকে এই প্রকার চিন্তা হইতে আশ্বাস লাভ করিতেছে, যাহাই হউক না কেন, ইহাদের ভিতর দিয়া, সভ্যতা ধীরভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর। ক্ষুদ্র মানুষের সুখ দুঃখ অনন্ত প্রবহমাণ মানবস্রোতে ভাসিয়া যায়,—মানুষ কত আসে কত যায়, তাহার খোঁজ কে রাখে? মানবসভ্যতাই যে আসল সত্য, তাহার জীবন নূতনের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ পূর্ণ হইতেছে। ঝরা ফুল ঝরা পাতার মধ্যে মানব-সভ্যতার চির-বসন্তের ফোটা ফুল ও সবুজপাতার মহামেলা।

কিন্তু এই প্রকার চিন্তার একটা প্রধান দোষ—ইহাতে আমার জ্ঞানের মহিমা, আমার ক্রিয়ার সার্থকতা থাকে না। সভ্যতার উপর আমি যদি আমার ব্যক্তিত্বের ছাপ না মারিতে পারি, আমি যদি সভ্যতার একটানা স্রোতে ভাসিয়া যাই, তবে আমার ব্যক্তিত্ববিকাশে আনন্দ কোথায়? আমি স্বার্থত্যাগ করিলাম, কিন্তু সে স্বার্থত্যাগের মহিমা কোথায়? সভ্যতার বিকাশের সহিত আমার মনের একটা আনন্দযোগ না থাকিলে সভ্যতা আমার পক্ষে অন্তঃসারশূন্য, আমি সেখানে একটা প্রাণহীন পুতুলমাত্র।

বহিঃপ্রকৃতির ও অন্তঃপ্রকৃতির বিরোধ

ইউরোপে ভিতর হইতে যেমন মানুষের হৃদয় কোথায়ও একটু আশ্রয় পাইতেছে না, সেরূপ বাহিরের সমাজ, শিল্প ও ব্যবসায়ক্ষেত্রের পাকচক্রের মধ্যে তাহাকে যেন একটা ক্ষুদ্র চাকায় পরিণত করিয়াছে, সে অনবরত ঘূরপাকই খাইতেছে, কোথাও যে একটু দাঁড়াইয়া সে আপনাকে একটু

সমঝিয়া লইবে তাহার উপায় নাই, সে ঘূরপাকই খাইতেছে,—আর ভিতর হইতে সে বুঝিতেছে সে কত ছোট, কত ক্ষুদ্র!

উনবিংশ শতাব্দীতে জীববিজ্ঞানের প্রতিপত্তি। বিংশ শতাব্দীতে মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। দুইয়ে মিলিয়া জীববিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত নব্য দর্শনের সদ্যঃ সৃষ্টি হইয়াছে (the Philosophy of Biology)। ইউরোপের দর্শনবিজ্ঞানের ইহাতেই শেষ কথা পাওয়া যাইবে। শিল্পযুগের কল-কারখানা, সমাজের পাকচক্র যেমন মানুষকে যন্ত্রের মত চালাইয়া তাহাকে ছোট করিয়া ফেলিতেছে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানেও প্রকৃতিরাজ্যে সেইরূপ মানুষের ক্ষুদ্রত্বকে আরও প্রকটিত করিতেছে। প্রকৃতিরাজ্যে মানুষ এক অব্যক্ত অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বশবর্ত্তী, প্রকৃতির এই নিয়ম মানুষের বুঝিবার সাধ্য নাই, ইহাই জীববিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। প্রকৃতি অনেক যত্ন করিয়া অনেক সাবধানে এক জাতীয় জীব তৈয়ারী করিল; সেইরূপ যত্ন ও প্রয়াসে আর এক প্রকার জীব তৈয়ারী করিয়া প্রথম প্রকার জীববংশের লোপসাধন করিল। জীবন-সংগ্রামে যে জীব টিকিয়া গেল, সে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কত বিপুল প্রয়াস কত অসাধারণ ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু শুধু বাঁচিয়া রহিবার প্রয়োজন কি? জীবন-সংগ্রামের উদ্দেশ্য যদি শুধু আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায়ে রক্ষা করা হয়, তবে এত উদ্যম এত কুশলতা এত ব্যর্থতার সার্থকতা কোথায়? প্রকৃতি বিভিন্নজাতীয় জীবের ক্রমবিকাশ সাধন না করিয়া তাহাদিগকে নিম্নস্তরেই রাখিয়া সেই উদ্দেশ্য ত সাধন করিতে পারিত! জীবজগতে জীবন-সংগ্রাম এত কঠোর, কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য ত কিছুই নাই, শুধু মৃত্যু হইতে আপনাকে রক্ষা করা! প্রকৃতির নিয়মের কি কোনই উদ্দেশ্য নাই?

বিজ্ঞানবুদ্ধির ব্যর্থতা ও নব্য দর্শনবাদ

তাহা ছাড়া, জীববিজ্ঞান আরও দেখাইতেছে, মানুষ, যে এই ক্রম-বিকাশধারার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি,—সেই শুধু তাহার দেহের গঠনে নহে, মনের

প্রকৃতিতেও, নিম্নস্তরের জীবে যে সকল শক্তির প্রক্রিয়া দেখা যায়, তাহাদের সম্পূর্ণ দাস। জন্মাধিকার ও জন্মনিকেতন—মানুষ এদের নিকট যে একবারেই পরাধীন, এদের নিকট দাসখত চিরকালের জন্য লিখিয়াছে,—শেষে মানুষ পর্য্যন্ত প্রকৃতির নিয়ম হইতে একচুল নড়িতে পারে না। প্রকৃতির লীলার মধ্যে সে কি শুধু নাচের পুতুল? প্রকৃতির লীলা কি এতই ভীষণ, এতই নিদারুণ,—সে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিয়া, মানুষের মনুষ্যত্বকে একেবারে গ্রাস করিয়া, তাহাকে শুধু ভূতের বেগার খাটাইতেছে!

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান এখানে একবারেই নিরুত্তর। বিজ্ঞান-বুদ্ধি এখানে একবারে হটিয়া গেল। বিজ্ঞান ক্ষোভে ও রাগে বলিয়া উঠিল,—প্রকৃতির কি নিদারুণ অভিশাপ, মানুষ কি পরনির্ভর, কি পরবশ!

বার্গসঁর আশার বাণী

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠিত দর্শন আশার বাণী প্রচার করিল। বার্গসঁ এই নূতন দর্শনের স্রষ্টা। উনবিংশ শতাব্দীর জীববিজ্ঞান পাশ্চাত্য সভ্যতার যে অবসাদ আনিয়া দিয়াছিল, তাহা হইতে বার্গসঁ তাহাকে রক্ষা করিলেন। বার্গসঁ বলিলেন, তুমি প্রকৃতির ক্রমবিকাশের নিয়ম বুঝিবে না, সে মানুষ বুঝিতে পারে না—বুঝিবার নহে, কিন্তু তাহাই হইতেছে জগতের সার সত্য, তুমি বিশ্বপ্রকৃতির সেই অনন্ত ক্রমবিকাশধারায় আপনাকে ভাসাইয়া দাও, আসল সত্য তুমি উপলব্ধি করিবে। অধ্যাপক হার্কস্‌লি বহুকাল পূর্ব্বে যে নিতান্ত ক্ষোভের সহিত বলিয়াছিলেন,—বিশ্বপ্রকৃতি মনুষ্যের অন্তঃপ্রকৃতির একান্তবিরোধী, সেই বিরোধের এত দিন পরে মীমাংসা হইল। এই বিরোধ পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে যে একটা নিরাশা, একটা অবসাদ, একটা মোহ আনিয়া দিতেছিল, তাহা বার্গসঁ দূর করিলেন বলিয়া বার্গসঁ ইউরোপের আধুনিক চিন্তাকে এত

নিবিড় ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তিনি শুধু দার্শনিক নহেন, আধুনিক ইউরোপ তাঁহাকে prophet বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

বিশ্ব লীলাময়, আমার কি লীলা নাই ?

কিন্তু এই নব্য দর্শনেও আবার সেই বিশ্বধর্ম্মের প্রতিপত্তি, স্বধর্ম্মের লোপসাধন। বার্গস্ঁ বলিলেন, তুমি তোমার অন্তঃপ্রকৃতিকে বিশ্ব-প্রকৃতির অনন্ত লীলার মধ্যে ডুবাইয়া দাও, তোমার জ্ঞানে অসঙ্গতি থাকিবে না। তুমি স্বাতন্ত্র্য অনুভব করিবে, আপনাকে বিশ্বলীলার মধ্যে একবারে বিসর্জ্জন দিলে। বার্গসঁর Philosophy of change, লীলাত্মক দর্শনের মূল কথা হইতেছে, বাহ্য ও অন্তর্জ্জগতের সার সত্য—লীলা; সে লীলার আদি নাই, অন্ত নাই, ভূত নাই, ভবিষ্যৎ নাই—ইহা সদা চঞ্চল, নিত্য নূতন সৃষ্টি ইহার একমাত্র ধর্ম্ম, বর্ত্তমানের প্রকাশেই ইহার অস্তিত্ব। বিশ্বব্যাপী অনন্ত প্রবাহের মধ্যে আপনাকে ভাসাইয়া দিলে তুমি ত অতীতের জ্ঞান হইতে মুক্ত হইবে, ভবিষ্যতের ধারণা হইতে মুক্ত হইবে, চলাই তোমার তখন একমাত্র ধর্ম্ম হইবে;—তুমি তখন বুঝিবে, ঐ নিরন্তর চলাই তোমার স্বধর্ম্ম, ঐ চলাতেই তোমার স্বাতন্ত্র্য,—তোমার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ হইবে বিশ্বলীলার মধ্যে তোমার লীলাময় অস্তিত্ব অনুভব করিয়া। তোমার পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইবে মহাকালের লীলাময় অস্তিত্বকে একমাত্র সত্য বলিয়া অনুভব করিয়া। বার্গস্ঁ বলিলেন, এই পরম অনুভূতি—এই পরম জ্ঞান লাভের জন্য, তুমি কর্ম্ম ছাড়িয়া দাও, সমাজকে ত্যাগ কর,—তুমি দীক্ষা লও, যোগাভ্যাস কর।

সেই হেগেলীয় দর্শনের মত আবার আমরা বিশ্বধর্ম্মে স্বধর্ম্মকে লীন হওয়া দেখিলাম। আমি যে স্বরাট্। কিন্তু বিশ্বরাজের অর্থের নিকট আমার স্বার্থ চাপা পড়িয়া গেল, বিশ্বধর্ম্ম স্বধর্ম্মকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। আমি যে স্বাধীন, বিশ্বরাজ আমাকে যে ক্রয় করিয়া ফেলিল। ইহা যে

অনন্ত বেদনা অনন্ত হাহাকার! পাশ্চাত্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যে নব্য-দর্শনের ভিতর আশার বাণী খুঁজিয়া পাইল ভাবিয়াছে, তাহার ভিতর এই অনন্ত বেদনা, অনন্ত হাহাকার লুক্কায়িত রহিয়াছে।